ব্রহ্মবিদ্যালয়

অজিতকুমার

ব্রহ্মবিদ্যালয়

অজিতকুমার চক্রবর্তী -প্রণীত অপর দুইখানি গ্রন্থ, 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্যপরিক্রমা' কিছুদিন পূর্বে বিশ্বভারতী কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাতায়ন, খ্রীষ্ট, রাজা রামমোহন, ও লোকহিতের আদর্শ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ব্রহ্মবিদ্যালয়

অজিতকুমার চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের
পঞ্চাশবর্ষপূর্তি-উৎসব
উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত
৭ পৌষ ১৩৫৮

প্রকাশক পুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

'ব্রহ্মবিদ্যালয়' ১৩১৮ সালে শান্তিনিকেতনের 'বার্ষিক সভায় পঠিত' হয় এবং ঐ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি (১৩০৮-৫৮) উপলক্ষে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল। গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ-প্রসঙ্গে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমের মহর্ষি-কৃত ট্রস্ট্‌ডীড ও রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র, যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিশিষ্ট রূপে বর্তমান সংস্করণে নূতন যোগ করা হইয়াছে।

চিত্রসূচী

তিনি
আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।
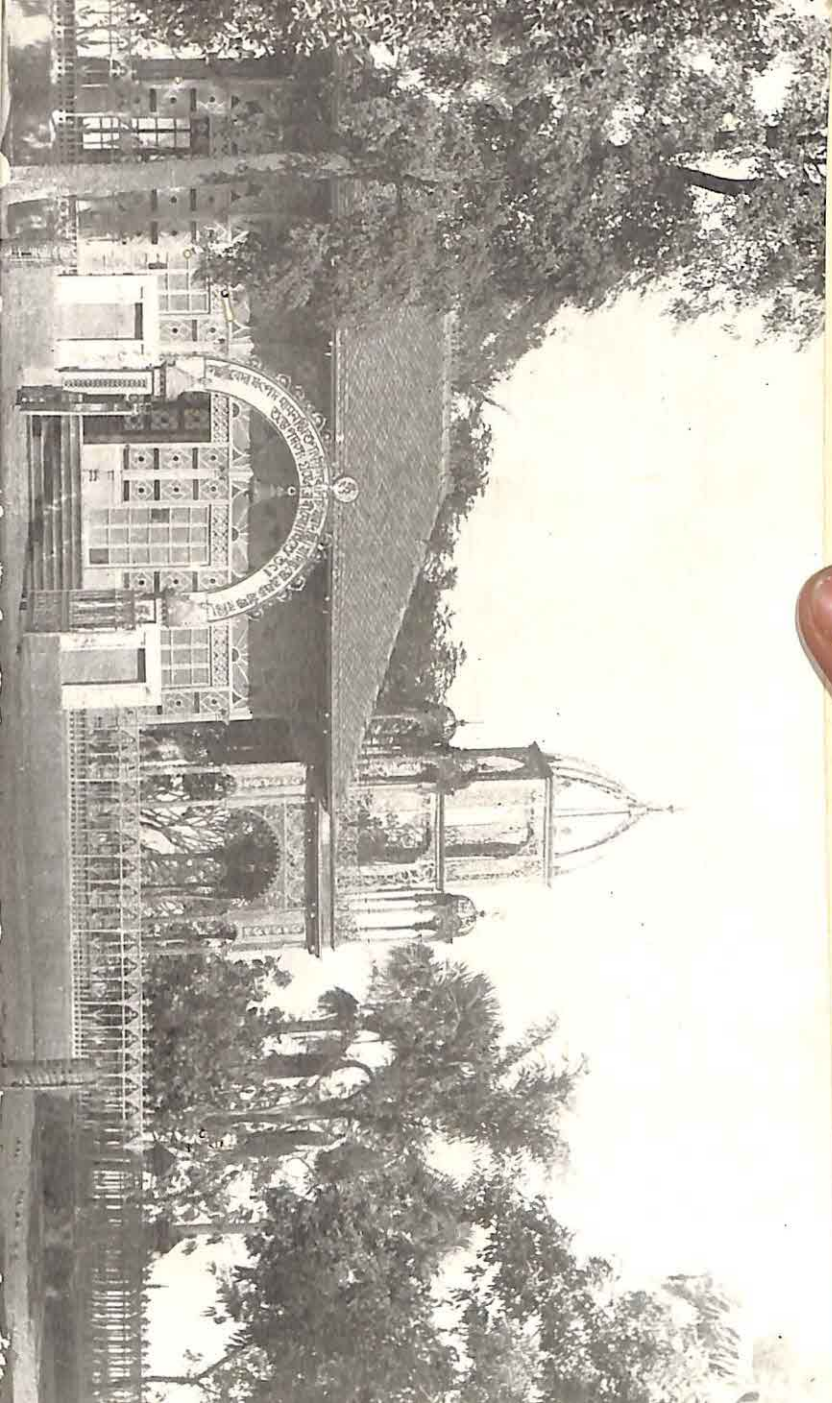
আমাদের আশ্রমের ইতিহাস বাহিরের ঘটনার দিক হইতে আলোচনা করিয়া কোনো লাভ নাই, কারণ এখানে যেসকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা ভিতরের দিক হইতে ঘটিয়াছে। আমরা ইহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য একাদশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ-কালে যেরূপ বুঝিয়াছিলাম আজ ঠিক সেইরূপ বুঝিতেছি না, এবং আজ যাহা বুঝিতেছি তাহা যে সম্পূর্ণ বোঝা তাহা কে বলিতে পারে। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া একটি কথা স্পষ্ট হইয়াছে মাত্র; সে কথাটি এই যে, বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে সত্যকে জানা এক জিনিস, আর কর্মের মধ্য দিয়া তাহাকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া জানা আর-এক জিনিস। তেমন করিয়া জানা কোনো কালেই নিঃশেষিত হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে বহুকালাবধি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত আছি বলিয়া ইহাকে দূরে স্থাপন করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্লিপ্তভাবে দেখিতে হয়তো আমি অক্ষম; কিন্তু তেমন করিয়া যদি না দেখি তবে ইহার সত্যকে দেখিতে পাইব না। কর্মের প্রবাহে উপচীয়মান নানা সংস্কারের দ্বারা ইহাকে এমন ক্ষুদ্র, এমন ঘোরো করিয়া দেখিব যে, ইহা যে বিশ্বের জিনিস সেই কথাটা চাপা পড়িয়া যাইবে। মনে হইবে যে, ইহাকে যেন আমরা এই কয়টি লোকে মিলিয়াই গড়িয়া তুলিতেছি। আমরা কী নিয়ম করিলাম আর কী উলটাইলাম তাহাই যেন ইহার মধ্যে

একমাত্র দেখিবার ও আলোচনা করিবার বিষয়। আধুনিক ভারতবর্ষে যে ইতিহাস আমাদের চিত্তসমুদ্র ভিতর হইতে বাহির হইতে নানা বিচিত্র শক্তির একত্র প্রভাবে মন্থন করিতেছে, যে মন্থনে ক্রমাগতই নব নব উদ্যোগ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, এবং যাহার আর বিরাম নাই, সেই ইতিহাসেরই গূঢ় গভীর অভিপ্রায় এই বিদ্যালয়ের জন্মদাতা; ইহার মধ্য দিয়া সে আপনাকে সুসিদ্ধ করিবার উপায় খুঁজিতেছে, এই কথাটি নিশ্চিতরূপে জানিতে হইবে। নহিলে ইহাকে আমাদের পাঁচ জনের বিদ্যালয় বলিয়া এমন মায়ার সৃষ্টি করিব যাহা হাস্যকর। আমরা! আমরা কী সৃজন করিব! সৃজনের লীলা যাঁর আমরা তাঁহার মালমশলা; তিনি আমাদের জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদকে কোথায় কী ভাবে সাজাইয়া তাঁহার বিপুল প্ল্যানকে ক্রমে ক্রমে বর্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে গড়িয়া তুলিতে থাকিবেন সে তিনিই জানেন। আজ যে উদ্যোগ এখানে দেখিতেছি তাহার সূচনাও কোন্ অতীতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও যেমন আমরা জানি না, তাহার পরিণামও যে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত তাহাও আমাদের কাছে তেমনি অপরিজ্ঞাত।

যেমন ধরো আমরা জানি যে, ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসরের উপর এই শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন বিদ্যালয় ছিল না তাহা সত্য, অথচ তাই বলিয়া এ কথা কী করিয়া বলি যে,

ইহার আরম্ভ সবেমাত্র একাদশ বৎসর পূর্বে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কি এই বিদ্যালয়ের যোগ নাই। খুবই আছে। শান্তি-নিকেতন ইহার জননী, বিদ্যালয় তাহার সন্তান, শান্তিনিকেতনের গর্ভেই বিদ্যালয় আপনার শরীর পাইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্মের পূর্বের সেই গর্ভের ইতিহাসকে একেবারে অগ্রাহ্য করা তো চলে না। এমনি করিয়া দেখা যায় যে, আমরা যেখানে ইহার আরম্ভ কল্পনা করি সেখানে ইহার আরম্ভ হয় নাই, সে একটা মাঝখানের পর্ব। ঠিক তেমনি যদি, এখন যেটুকু হইয়া উঠিয়াছে তাহারই ক্ষীণ মাপকাঠির সাহায্যে ইহার ভবিষ্যৎকে পরিমাপ করিতে যাই তবে সেইরকমই মিথ্যা হইবে। হয়তো বা এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে যে, ইহা একটি এন্‌ট্রান্স স্কুলের উত্তম সংস্করণ, কিম্বা ভালো একটি বোর্ডিং স্কুল; ছেলে পড়াইবার এমন সুবিধা অন্যত্র পাওয়া যাইবে না। তাই বলিতেছিলাম যে, ইহা যে আমাদের পাঁচ জনের একটা কীর্তি, এই মিথ্যা কথাটা আজ ভুলিতে হইবে— এ কথা নিঃসন্দেহে জানিতে হইবে যে, ইহার উদ্দেশ্যকে আমাদের কীর্তি এবং রচনাই অনেক জায়গায় আবৃত করিয়াছে, খর্ব করিয়াছে এবং করিতেছে; আমরা এখানে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের ভুলিতে পারি নাই, মহৎ উদ্দেশ্যের পায়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে জলাঞ্জলি দিয়া ইহার প্রকাশকে বাধাহীন ও দীপ্যমান করিতে অসমর্থ হইয়াছি।

আজ তাই আপনাদের কাছে কীর্তির গৌরব লইয়া আসি নাই, বরং খুবই কুণ্ঠা এবং বেদনা লইয়া আসিয়াছি।

আত্মোৎসর্গ পরিপূর্ণ হয় নাই জানি। 'হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী আমি কি গাহিতে পারি।' তবু যখন মহৎ উদ্দেশ্য এই অযোগ্যদের দ্বারাই আপনাকে আপনি সফল করিবেন, তখন সেই আশায় নিজের সমস্ত ত্রুটি-অপরাধ ভুলিয়া ভাঙাচোরাকে কেবলই জোড়া দিবার চেষ্টায় লাগিয়া যাই। ভাঙা তো তাঁর দিককার নয়, সে আমার দিককার। হয়তো আবার কোথায় ছিদ্র দেখা দিবে। তথাপি আশা ছাড়ি না, মেরামত করিয়া করিয়া চলি।

বাস্তবিক আশ্রমের ইতিহাসে আমরা এই কথারই প্রমাণ পাইব। আমরা ভাঙিতেছি এবং মেরামত করিতেছি। এই একাদশ বৎসরেই কতবার সূত্র ছিঁড়িল, আবার ছিন্ন সূত্র কুড়াইয়া নূতন করিয়া মালা গাঁথিতে কতবার বসিলাম। আমাদের প্রত্যেকের অভাব অসম্পূর্ণতা সেই এক-একটি ছিদ্র, আমাদের প্রত্যেকের ভাব এবং যথার্থ সম্পদ সেই ছিদ্র-পূরণে ব্যস্ত। এই এক রকমে একটা সৃষ্টির কাজ এখানে চলিতেছে। আর-এক রকমে আর-একটা কাজ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে— যেখানে ভাঙাগড়ার ব্যাপার নাই, যেখানে একেবারে অখণ্ড সৃষ্টি। আমাদের সৃষ্টি কেমন, না প্রবাল-দ্বীপের মতো— টুকরার সঙ্গে টুকরা মিলিয়া ক্রমে একটা ছোটো দ্বীপ জাগিতেছে; আর ভিতর হইতে যে সৃষ্টি চলিয়াছে সে কেমন, না একেবারেই এক উচ্ছ্বাসে সমুদ্রের মধ্য হইতে মহাদেশের আবির্ভাবের মতো। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই এই দুই দিক দিয়া সৃষ্টিব্যাপার চলে। কতকটা গড়ে মানুষ

আপনার বিচিত্র প্রয়োজন অনুসারে, কতকটা গড়েন বিধাতা আপনার অমোঘ অভিপ্রায় অনুসারে। প্রতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের গড়া এবং সেই বিধাতৃপুরুষের আকস্মিক গড়া, এ দুই যেখানে সম্মিলিত না হয় সেখানে মহৎ ঘটনা কখনোই সম্ভব হয় না। এই উভয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের দেখিতে হইবে, আমাদের প্রতিষ্ঠান কী হইয়া উঠিতেছে।

এক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মকে দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিলেন। তিনি ব্যাকুলভাবে ধর্মকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ধর্মের জন্য বেদনায় মধ্যাহ্নের রবিরশ্মি তাঁহার কাছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। তিনি সত্যের জন্য বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্ব হইয়াও দুঃখবোধ করেন নাই। তাঁহার এই সাধনা ব্রাহ্মসমাজকে এ দেশে জন্ম দিল। অথচ মহর্ষির ধর্মজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই দেখিতে পাই যে, তিনি এক দিনও মনে করেন নাই যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি ইহার প্রতিষ্ঠায় বিধাতার হস্তই দেখিতে পাইতেন, নিজের হস্ত নহে। 'আমার এই রচনার দ্বারাই সত্য প্রকাশ পাইতেছেন', সত্যকে তিনি এত ক্ষুদ্র এত পরিমিত করিয়া জানিতেনই না। তিনি জানিতেন যে সত্য আপনার ভার আপনি গ্রহণ করে, কাহাকেও তাহার ভার লইতে হয় না। সেইজন্য তিনি কী করিয়াছেন বা করিতে পারেন সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, তিনি কেবলই পরিপূর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তো ব্রাহ্ম-সমাজের স্থাপয়িতা, কিন্তু কোথায় তাঁহার দলবল, তাঁহার

চেলাবর্গ কোথায়। ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে তো ধর্মসভা, সে তো সম্প্রদায় নহে। যখনই সম্প্রদায়ের গোলযোগ উঠিল, মতামতের বাদবিসম্বাদ জাগিল, তখনই তাঁহার যেটুকু কাজ তাহা ভাঙিল; কিন্তু তাঁহার ধৈর্য কি কিছুমাত্র টুটিয়াছিল। তিনি একলা পড়িতেও ভীত হইলেন না। ইহার কারণ, তাঁহার দৃষ্টি কোনো উপস্থিত কর্মসাধনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল না; কোনো বিশেষ একটা উদ্দেশ্য, হোক তাহা সমাজসংস্কার বা অন্য কিছু, তাহাকেই সার্থক করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া মরাকে তিনি ধর্মসাধনা বলিয়া জানিতেন না। তাঁহার মন্ত্র ছিল ঈশাবাস্যং— জীবনকে ভিতর হইতে শোধন করিয়া একেবারে অখণ্ড সত্যের দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলা। সেইজন্য ক্ষতি দুর্যোগ আঘাত, এইসকল সাময়িক ব্যাপারে তিনি বিচলিত হইতেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন এমন লাভ, যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ— যাহা পাইলে আর কোনো লাভকেই তদপেক্ষা বড়ো বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার কৃতকর্ম ভাঙিল, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক শান্তি আরও দৃঢ়ীভূত হইল। এমন করিয়া নিজের সৃষ্টিকে নিজের চক্ষে বিপর্যস্ত হইতে দেখিলে অতিবড়ো মানুষেরও চিত্ত ভয়ংকর ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে এমন নীরব হইলেন যে, আত্মজীবনীখানিও শেষ করিলেন না।

মহর্ষি সম্বন্ধে আমি এত কথার আলোচনা কী কারণে করিতেছি তাহা বলা আবশ্যক। এই শান্তিনিকেতন তো তাঁহার আশ্রম। সুরুলের রায়পুরের সিংহপরিবারের সঙ্গে

তাঁহার বন্ধুতা ছিল। একদিন বোলপুর হইতে সেই তাঁহাদের ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাইবার কালে পথে কিয়ৎকালের জন্য তিনি এই তৃণশূন্য প্রান্তরে ঐ সপ্তপর্ণদ্রুমতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কী অনুভব করিলেন জানি না, কিন্তু এই স্থানটি তাঁহার সাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন। এখানে তাহার পরে তাঁবু ফেলিয়া তিনি বাস করিতেন। এখানে তিনি তাঁহার 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'কে পাইলেন। এই মরুভূমিতে অন্য স্থান হইতে মাটি আনাইয়া বাগান করিলেন, বাড়ি উঠিল, কাঁচের মন্দির নির্মিত হইল, ট্রস্টডীড করিয়া ইহাকে সকলের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া গেলেন। যাঁহারা তপস্যা করিবেন তাঁহাদের এই স্থান। নিষেধ রহিল শুধু মদ্যমাংসাহার, কুৎসিত ও অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ ও প্রতিমা-পূজা।

সে আজ চল্লিশ বৎসরেরও বেশি দিনের কথা। তাহার পর এতদিন পর্যন্ত এ স্থান তো শূন্য পড়িয়া ছিল। মন্দিরে বেতনভুক্ পূজারী নিয়মিত শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া যাইত মাত্র। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যখন গেল তখন তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র এই আশ্রমকেই কেন তিনি একটা কিছু জাঁকালো কাণ্ড করিয়া গেলেন না। তিনি বেশ জানিতেন যে এ আশ্রমে কিছুই হইতেছে না; তবু একজন পূজারী এখানে সুর ধরিয়া থাকে এই আকাঙ্ক্ষাটুকু করার কী সার্থকতা ছিল। এ সম্বন্ধে অনেকে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, 'শান্তিনিকেতনের জন্য তোমাদের কাহাকেও ভাবিতে হইবে

না, সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন, সেখানকার কাজ কিছুই হইল না দেখিয়া মরিলেও জানিব, কাজ হইবেই।' তিনি সত্যকে নিজের চেয়ে অনেক বড়ো বলিয়া জানিয়াছিলেন বলিয়াই সত্য সম্বন্ধে তাঁহার ধৈর্য ছিল। তাঁহার সাধনা সত্যের হাতে আপনাকে বিসর্জনের সাধনা— হইবার সাধনা, করিবার নয়। 'কাজ হইবেই।' কারণ কাজ যে বিধাতা স্বয়ং করিবেন।

যিনি আমাদের এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার এই সাধনাই আমাদেরও মর্মগত সাধনা। আমরা যেন তাঁহার মতো মনে করিতে পারি যে, বিধাতা গড়িতেছেন, আমরা নয়। মহর্ষি চিরজীবন কর্ম করিয়াছিলেন অথচ কর্মবন্ধনে ধরা দেন নাই। আমরাও কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করিবার সাধনাতেই লাগিয়াছি, কেবল কর্মজালে জড়াইয়া নিজেদের প্রচার করিবার জন্য এখানে আসি নাই। 'কাজ হইবেই।' আজ যদি ভাঙে, কাল গড়িবে— একশত বৎসর যদি-বা সে চুপ করিয়া থাকে, তাহার পরেও তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইবেই; যাহা হইবার তাহা হইবেই, তুমি শুধু আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া যাও। কারণ সেই পরিপূর্ণতাই বৃহৎ কর্মকে ফলবান করিবার উপায়। মাটি যদি সরস না হয় তবে শস্য হইবে কিসের উপর। তুমি অমৃতধারায় জীবনভূমি পূর্ণ করো, এই তোমার কাজ; তাহা হইলেই সেই অন্যান্য কাজ হইবেই। 'কাজ হইবেই।'

আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রে বলে যে, কর্ম করিবে, কিন্তু কর্মফল আকাঙ্ক্ষা করিবে না। আমরা এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়া উঠি না। কিন্তু মহর্ষির জীবন এই বাণীর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

তিনি কর্ম করিয়া অকৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই অকৃতার্থতাকেই তিনি সার্থক করিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি ফল পাওয়ার যে 'প্রগ্রেস' তাহা তিনি কোথাও কামনা করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরতির ইংরেজি নাম কন্‌জার্ভেটিজ্‌ম্‌ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার জীবনে আমরা দেখি যে, তিনি যে ফল পান নাই ইহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। 'তোমরা চিন্তা করিয়ো না, কাজ হইবেই।' তিনি জানিতেন যে, আমাদের কাজ ঐ একবার ভাঙা, একবার মেরামত করা—ঐ প্রবালদ্বীপ গড়া বড়োজোর; আর বিধাতার কাজ এক উচ্ছ্বাসে মহাদেশ-গঠন। কারণ তাঁর সৃষ্টিই অখণ্ড সৃষ্টি। বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনায় পদে পদে তাই এই দুই রকমের সৃষ্টির লীলা আমরা দেখিতে পাইব, তাহা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-স্থাপনের সংকল্প করিলেন তখন মহর্ষি তাঁহাকে এই কার্যে খুবই উৎসাহ দিলেন। আমি কবির সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতে তাঁহার মনে হঠাৎ এরূপ সংকল্পের উদয় হইল কেন তাহার কারণ নির্দেশ করিয়াছি। তাঁহার কাব্য-জীবনের ভিতর দিয়াই তাঁহার একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল—পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে গূঢ়নিবিষ্ট কেবলমাত্র ভাবময় জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি দিতেছিল না; আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া একটা বড়ো ত্যাগের

জীবনের জন্য তাঁহার বেদনা জাগিতেছিল। কাব্যের পথ দিয়াই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজতত্ত্বে ধর্মনীতিতে প্রবেশ করিলেন ; সর্বত্রই দেখিলেন, আপনাকে ক্রমাগত খর্ব করিয়া পূর্ণরূপে ত্যাগের আদর্শই কেবলই প্রকাশ পাইয়াছে। এই ত্যাগ ভোগের বিপরীত নহে, কিন্তু ভোগেরই পরিপূর্ণতির রূপ ; যেমন পরিপূর্ণ মঙ্গল হইতেছেন শিব, কারণ তাঁহার সবই অমঙ্গলের ব্যাপার, পরিপূর্ণ সুন্দর কৃষ্ণ, কারণ তাঁহার বাহ্য সৌন্দর্য কোথাও নাই। তার মানে আর কিছুই নয়, ভারতবর্ষ অমঙ্গলের অন্তরের মধ্যে শিবকে দেখিয়াছিল, বিরূপতা ও রূপের অভাবের মধ্যে অপরূপকে কামনা করিয়াছিল, ভারতবর্ষ সৌন্দর্যকে মঙ্গলকে প্রেমকে ভূমার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিয়াছে। হরি এবং হর এই উভয়ের সম্মিলনেই আত্মার সম্পূর্ণতা। তেমন করিয়া দেখিলে সমস্তই একাকার হইয়া মিলিয়া যায়, কোনোটাই একান্ত হইয়া জীবনকে পুরাপুরি অধিকার করিয়া বসিতে পায় না। কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে, রামায়ণে মহাভারতে পুরাণে এই ভাবের পরিচয় পাইয়া কবি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কালিদাসের মতো তাঁহার মাথাতেও তপোবনের কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমের আদর্শের মতো জীবনযাত্রার এমন পূর্ণাদর্শ আর হইতেই পারে না। এ আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়— বাল্যে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা,

সমস্ত জিনিসকে সেই বড়ো দিক হইতে আনন্দের দিক হইতে দেখিতে শিক্ষা করা, যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বার্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারবন্ধনকে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান, তাহার পর মৃত্যুর সময় একাকী পরলোকে প্রয়াণ— শিক্ষাকে সংসারকে বিষয়ভোগকে এমন মুক্তির সোপান করিয়া তোলার মতো আদর্শ আর কোথায়। সুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে বানপ্রস্থ্য জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রৌঢ়বয়সে কবিকে পাইয়া বসিল। আদর্শ কেবল কল্পনায় নয় প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে তিনি উৎসুক হইলেন।

ভারতবর্ষের এই আদর্শ তাঁহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ইহারই ঝোঁকে ভারতবর্ষের সমস্তই আশ্চর্য ও রমণীয় করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চারি দিকেই তখন প্রবল প্রতিক্রিয়ার স্রোত বহিতেছিল। তাহার কারণ কতকটা রাজনৈতিক ছিল, তাহা ভিক্ষুকের নৈরাশ্য; কিন্তু আসল কারণটা ছিল স্বাভাবিক— আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিমেই যে সব আছে, সে যে সর্ববিষয়েই আমাদের গুরু ও প্রভু— এ কথাটা সবলে অস্বীকার করিবার ও ইহার উলটা কথাটা বলিবার একটা জেদ তখন শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ পাইতেছিল। সেটা স্বদেশীর পূর্বরাগ। আত্মপ্রতিষ্ঠা আমাদের চাইই, কিন্তু তাহার ভিত্তিটা যে কোথায় তাহা খুঁজিবার জন্য প্রাচীন কালের মধ্যে ডুব দিবার একটা উদ্যোগপর্ব চলিতেছিল।

আমাদের সবই ছিল এবং পশ্চিমের চেয়ে অনেকাংশে ভালোই ছিল— এই জয়ঘোষণার উৎসাহ।

য়ুরোপে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের কোনো বিরোধ নাই, সমাজের মধ্যে নানা ভাবে যেসকল চেষ্টা ও চিন্তা জাগিতেছে বিদ্যালয়ে তাহাই স্থান পাইয়া বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীগণকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তৈরি করিতেছে। ইহা দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে. আমাদেরও ভিতর হইতে একটা বিদ্যালয় ঠিক তেমনি করিয়া জাগে। সে আধুনিক বিদ্যালয়ের ন্যায় বাহিরের পুঁথি পড়াইবার ও পরীক্ষা পাশ করাইবার একটা যন্ত্রমাত্র না হউক, সে আমাদের দেশের ভাবে রসে চিন্তায় কল্পনায় উদ্‌বোধিত করিয়া অনুকরণবৃত্তি হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া আমাদের সমাজকে একটি বিশেষ শক্তি দিক। বাস্তবিক এই ইচ্ছাই আমাদের এই আশ্রমপ্রতিষ্ঠার ভিতরকার ইচ্ছা ছিল। কেবল কলের শিক্ষা নয়, বিশ্বপ্রকৃতির রমণীয় বেষ্টনের মধ্যে গুরুগৃহে ভারতবর্ষের এখনকার সন্তানেরা মানুষ হইবে, তাহারা ভারতবর্ষকে জানিবে, প্রীতি করিবে, তাহারা উত্তরকালে গৃহস্থ হইয়া গৃহীর বিশুদ্ধ মঙ্গল আদর্শ রক্ষা করিবে, সমাজে নব নব মঙ্গলযজ্ঞ তাহারা সম্পন্ন করিয়া আমাদের দাসত্ব অর্থাৎ অন্তরের হীনতার পাশকে একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিবে— আশ্রমের আরম্ভে আমি যতদূর বুঝি এই ভাবটিই প্রবল ছিল। 'গুরুদক্ষিণা'র ভূমিকায় কবি তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে তাঁহার তপোবনকল্পনার যে চিত্র দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার এই সময়ের ভাব ও কল্পনা বেশ বুঝা যাইবে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

মোহিতচন্দ্র সেন

এই স্বাদেশিকতার উত্তেজনায় যাঁহারা তখন ভরপুর তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁহার আসল নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কেশববাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন ব্রাহ্মসমাজে খুবই যোগ দিয়াছিলেন ; তার পর তাঁহার মতের পরিবর্তন হইল, তিনি রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। আমার বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের প্রভাবে ধর্মের বহিরঙ্গ-সাধনার দিকে খুব ঝোঁক দিয়া আমাদের দেশের রূপের সাধনার মাহাত্ম্য যখন একদল শিক্ষিত লোক কীর্তন করিতেছিলেন, ভক্তিসাধনার পক্ষে ভাবের বিগ্রহ যে প্রয়োজনীয় এই কথা প্রচার করিতেছিলেন, তখন উপাধ্যায় মহাশয়েরও মতের পরিবর্তন হইয়া থাকিবে। তিনি পৌত্তলিক না হইয়া রোমান ক্যাথলিক হইয়া বসিলেন।

অথচ বেদান্তশাস্ত্রে এবং মোটামুটি হিন্দুধমশাস্ত্রে উপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকার ছিল। রোমান ক্যাথলিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার চিত্ত গভীরভাবে হিন্দুই থাকিয়া গেল। তবে কেন যে তিনি রোমান ক্যাথলিক হইয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। আমার মনে হয় যে, আদর্শ মনুষ্যের মধ্য দিয়া ধর্মকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা যে কারণে বঙ্কিমকে কৃষ্ণচরিত্র লিখাইয়াছিল সেই কারণে উপাধ্যায় হয়তো খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তিনি খৃস্ট ও মেরীর পূজা করিতেন। অথচ বেদান্তধর্মের এবং বর্ণাশ্রমধর্মেরও একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যে কিরূপ প্রবল স্বদেশাভিমানী ছিলেন তাহা প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনে

হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের কোনো আভাসমাত্রই ছিল না।

বিদ্যালয় আরম্ভ হইল। উপাধ্যায়মহাশয়ই ছাত্র ও অধ্যাপক জুটাইয়া আনিলেন। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হইত না। অধিক বয়সের ছাত্র লওয়া হইবে না. এই নিয়ম গোড়া হইতেই প্রবর্তিত হইল। ছাত্ররা নগ্নপদ হইল, উপানৎ এবং ছত্র -ধারণ দুইই তাহারা বর্জন করিল। প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যায় তাহাদিগকে চেলি পরিয়া উপাসনায় বসিতে হইত, তাহাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য দেওয়া হইত। রন্ধন ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কাজ তাহাদিগকে নিজের হাতে করিতে হইত। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বাঁধে তাহারা স্নানার্থ গমন করিত, তার পর শুচিস্নাত হইয়া উপাসনান্তে এখনকার ল্যাবরেটরি গৃহে বা মুক্ত প্রাঙ্গণে বেদগান করিত। সকল ছাত্র ও অধ্যাপক সেই সময়ে মিলিত হইতেন। উপাসনান্তে ছাত্ররা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতলে গিয়া উপবেশন করিত। ইংরেজি বাংলা অঙ্ক সংস্কৃত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইত। 'ইংরেজি সোপান' এবং 'সংস্কৃত প্রবেশ'-এর সেই সময়েই সূত্রপাত। কবি নিজে মুখে মুখে কথাবার্তা কহিয়া ইংরেজি শিখাইতেন, প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া বাক্য রচনা করিতে বালকেরা শিক্ষা করিত। এইরূপে ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যাকরণ স্বতন্ত্র করিয়া না পড়িয়া মাতৃভাষা

শিক্ষার ন্যায় ইংরেজি ও সংস্কৃত দুইই তাহারা শিখিত। বিজ্ঞানও প্রথমাবস্থায় তিনি নিজে অধ্যাপনা করিতেন, তার পর আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বিজ্ঞানে-সুপণ্ডিত জগদানন্দবাবু আসিবার পর হইতে তিনিই ছাত্রদের বিজ্ঞানশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে তপোবন বসিল। পড়াশুনা আরাম ও সুখভোগকে খর্ব করিয়া সরল জীবনযাত্রা, গুরুসেবা ও অতিথিসেবা, এইসমস্ত পূর্বকালের আশ্রমভাবে ছেলেরা বর্ধিত হইতে লাগিল।

বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক তখন বালকমাত্র, কিন্তু বেশ মনে আছে, একদিন বয়স্ক দেশমান্য পণ্ডিতসভায় রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম সম্বন্ধে তীব্র নিন্দাবাদ শুনিয়া কিরূপ অসহিষ্ণু হইতে হইয়াছিল। 'ইউটোপিয়া' কথাটা আপনাদের সকলেরই জানা কথা। তাহার অর্থ হইতেছে— ভাবের ইন্দ্রপুরী। পৃথিবীতে অনেক ভাবুক কেবল রচনায় যে এই ভাবের ইন্দ্রলোক নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা নহে, মর্তলোকেও সেইরূপ ইন্দ্রপুরী রচনার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। রস্কিন এক সময়ে Company of St. George -নামক একটি সমাজ-প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ করিয়াছিলেন। সেখানে সকলে কর্ম করিয়া পল্লী বাঁধিয়া ধর্মের আদর্শে জীবন রচনা করিবে, জীব-হিংসা করিবে না, ইত্যাদি নানা কল্পনা তাহার মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহা টিঁকিল না। যাহাই হউক, সেই সভায় শুনিলাম যে, কবির এটা একটা নূতন খেয়াল, আধুনিক কালের সঙ্গে না চলিয়া প্রাচীন কালের একটা ব্যাপারকে আধুনিক কালের

মধ্যে জোর করিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা—চারি দিককার প্রাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো এ কল্পনা ও উদ্যোগ শুকাইয়া মরিবে।

তখন কবির প্রতি বালকসুলভ অন্ধ ভক্তি-বশত বাহিরের এইসকল প্রতিকূল সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হইতাম, ভালো করিয়া কোনো কথাই বুঝিতাম না। আজ জানি যে, কথাটার সত্যতা আছে। কবিকল্পনা যেটুকু সেটুকু যতই মনোরম হউক তাহা একটা বহুলোকসমন্বিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রাণ দিতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকে প্রাণ দেয় একমাত্র সচেষ্ট সাধনা, সুদৃঢ় চরিত্রবল। প্লেটো এই কারণে তাঁহার আদর্শতন্ত্র হইতে কবিকুলকে নির্বাসিত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। জগতে যেখানে কবিরা ভাব সৃষ্টি না করিয়া কর্ম সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন সেখানেই তাঁহারা এইজন্য ব্যর্থ হইয়াছেন; স্থায়ী মঙ্গল গড়িয়াছেন মহাপুরুষেরা যাঁহারা নিছক ভাবলোকবিহারী নহেন।

কিন্তু সেই সমালোচকবর্গ একটি কথা মনে রাখেন নাই। তাঁহারা কবির এই উদ্যোগকে বহুপূর্বের মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সঙ্গে মিলাইয়া দেখেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা-প্রভাবের প্রতিক্রিয়াবশত কবি ব্রহ্মচর্যাশ্রম খাড়া করিতেছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণত সত্য নহে। নিজের জীবনের একটা বড়ো সামঞ্জস্যস্থাপনের বেদনাতেই এই বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছে— সে একটা আত্মার গভীর অভাব মোচনের গূঢ় ইচ্ছার কাজ, শুদ্ধ য়ুরোপীয় আইডিয়ার

সঙ্গে লড়াইয়ের বাহাদুরি করিবার জন্য এত দুঃখ এত ত্যাগের ভিতর দিয়া এত দুঃসহ বিরোধ কাটাইয়া কোনো মানুষ যাইতে পারিত না। অবশ্য আত্মার সাধনার সঙ্গে অনেক বাহিরের জিনিস জড়াইয়া পড়ে, কিন্তু সে সমস্তই বাহিরের, তাহারা আসে, যায়, পরিবর্তিত হইতে থাকে ; কিন্তু যে জিনিসটা সমস্ত ভাঙাচোরার ভিতরে, বাধাবিঘ্নের ভিতরে একনিষ্ঠ হইয়া কোনো মঙ্গলকে গড়িয়া তুলিতে থাকে তাহা আত্মার অন্তরের জিনিস। সেই আত্মা আপনার পরমার্থকে পাইবার জন্য সন্ধানে বাহির হইয়াছে বলিয়াই সত্য ক্ষণে ক্ষণে মূর্তিমান হইয়া পথ দেখাইতেছে, এইটেই আসল কথা। সত্যই পথ দেখাইতেছে বলিয়াই কোনো একটা স্থানে সে স্থির হইয়া নাই, ভিন্ন ভিন্ন নানা অবস্থার ভিতর দিয়া সন্ধানীকে কেবলই সম্মুখে টানিতেছে — বাধা বিঘ্ন ভাঙাচোরা তাহার পথে চালাইবার বড়ো বড়ো বাহন। আপনাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মার যে বেদনা সে বেদনা একলা কাহারও নহে, সে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই। যখন আমাদের মধ্যে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তখন আমাদের কাজও ম্লান হয়, আবার যখন তাহা উজ্জ্বল হয় তখনই কাজ সত্য হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিমাণে তাহার ক্রিয়া চলিতেছে, সেই ক্রিয়াশক্তিই এই বিদ্যালয়ের মূলশক্তি ; এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্বই তাই। যাহাই হউক, স্বাদেশিক উত্তেজনা নহে, আত্মার বেদনাই কবিকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়াছিল ইহা নিশ্চিত সত্য।

মহর্ষি কোন্ জায়গা হইতে এ আশ্রমকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন তাহা আজ বুঝা যাইতেছে। তিনি এ আশ্রমকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এই ভাব হইতে যে, যিনি একসময়ে এই প্রান্তরে তাঁহার কাছে দীপ্যমান হইয়াছিলেন তিনি বিবিধ মঙ্গল-অনুষ্ঠানে সকলের কাছে দীপ্যমান হউন। নহিলে এ আশ্রম তিনি উৎসর্গ করিবেন কেন। দেশের লোক ধর্মলাভ করুক, ইহাই তাঁহার একমাত্র কামনার বিষয় ছিল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আশ্রমকে নিঃসন্দেহই সেই বড়ো সৃষ্টির দিক হইতে দেখেন নাই। তিনি নিজের জোরে নিজের মতে নিজের শাসনেই এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন— সত্যকে যে পরিমাণে তাহার আপন কাজ করিবার অবসর দেওয়া উচিত, অন্যকে যে পরিমাণে স্বাধীনতা দিলে বিদ্যালয়ের কাজ যথার্থ আন্তরিক সাধনার কাজ হইয়া উঠিতে পারে, তিনি নিজের প্রবল ইচ্ছাবৃত্তি-বশত সে পরিমাণে ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যদিচ তিনি তখন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে লেশমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না তথাপি তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে সেই প্রচণ্ডতা ছিল যাহা মঙ্গলশঙ্খ ও সৌন্দর্যপদ্মকে বাদ দিয়া কেবল গদার আঘাত ও চক্রের চক্রান্ত দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করাকে সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা করিত। সুতরাং শান্তিনিকেতন-আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগ অতি অল্প কালেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কবির তখন অন্তরে বাহিরে সংগ্রাম— ঋণ, অর্থাভাব;

অথচ বিদ্যালয়ের জন্য সমস্তই তাঁহাকে একলা করিতে হইতেছে। তিনি যখন ঋণের ভারে প্রপীড়িত তখনই এই আশ্রম তিনি আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ভারের উপর ভার চাপিতে লাগিল। এ কার্যটি যে তাঁহার খেয়াল, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কেবল মহর্ষির উৎসাহ ছিল। তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন যে, যে সাধনা গোপনে পর্বতের গুহার মধ্যে নির্ঝরের মতো লুকানো ছিল সে লোকালয়ে নদীর কল্যাণধারার মতো এক্ষণে প্রবাহিত হইয়া চলিল— সে আর একলার নয়, সে এখন সকলের।

দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাত্রদের সঙ্গে রাখিবেন না বটে, তথাপি বেতন লইতে হইল। শিক্ষার আয়োজন এখন বিচিত্র এবং ব্যয়সাধ্য— শিক্ষকদিগের সংসার আছে, তাঁহাদিগকে বেতন দিতে হয়। সুতরাং ছাত্রদের নিকট হইতে পনেরো টাকা করিয়া মাসে মাসে লওয়া স্থির হইল। এখন যেখানে লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি আছে, পূর্বে সেখানেই বিদ্যালয়গৃহ ছিল; তার পর এই সময়ে টালির ছাদের ঐ লম্বা ঘরটি নির্মিত হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের তখন দুই বৎসর বয়স হইয়াছে।

কবির আত্মীয় এবং সুহৃদ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় আয়ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাবের ভার এই সময়ে গ্রহণ করিলেন। রমণীবাবু, স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এই তিন জনকে লইয়া একটি কর্তৃসভা গঠিত হইল। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া পড়াশুনা দেখিতেন এবং সকল বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিতেন।

তৃতীয় বৎসরে সতীশচন্দ্র রায় এই আশ্রমে আসিলেন। 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থে এবং তাহার ভূমিকায় তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কিন্তু আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় আরও বেশি করিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ তিনি এই আশ্রমের আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

তিনি অল্পবয়স্ক কলেজের ছাত্র ছিলেন কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য বোধশক্তি ও কল্পনাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্যের রসসমুদ্রের মধ্যে তিনি অহোরাত্র ডুবিয়া থাকিতেন। সংস্কৃত ইংরেজি বাংলা ফরাসিস্ ও জর্মান কবি ও রসজ্ঞদের রচনার ভাবরস সকাল হইতে দ্বিপ্রহর, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ও রাত্রির অনেক প্রহর পর্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া আনন্দে এমন ভরপুর হইতে কাহাকেও দেখি নাই। যে তাঁহার নিকটে আসিত তাহাকে তিনি সেই নেশা ধরাইয়া দিতেন। ব্রাউনিঙের কবিতা সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার আলোচনা পাঠ করিলে সেই আশ্চর্য রসগ্রাহিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ভাবরস তাঁহার কাছে পুস্তকের ছাপা পাতার মধ্যে বাঁধা ছিল মনে করিলে ভুল হইবে, সেই ভাবরসকে তিনি অপর্যাপ্ত অফুরন্ত উপভোগ করিতেন বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে। তিনি যে নেশা ধরাইতেন সে নেশায় আমাদের সকলকে তিনি ক্ষুদ্র আলাপ ও প্রাত্যহিক তুচ্ছতার জঞ্জাল হইতে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-উৎসবক্ষেত্রে বসাইয়া দিতেন, প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথ পূর্ণ হইয়া উঠিত। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—

সমস্ত আকাশ যে আনন্দ তাহা আমরা তাঁহার মূর্তি দেখিলেই এক মুহূর্তে বুঝিতে পারিতাম।

এক প্রকার সৌন্দর্যভোগ প্রায়ই দেখা যায় মানুষকে খুব অসংযম এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে লইয়া যায়— অনেক কবির জীবনের ইতিহাসে তাহা আমরা দেখিয়াছি। সতীশ এমন প্রবল ভোগী ছিলেন, অথচ আত্মত্যাগ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল। যখন ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহার নিঃস্ব অবস্থায় যাহা থাকিত তাহাই দান করিয়া বসিতেন, ছেঁড়া মলিন বস্ত্র পরিয়া ও মাদুরে শয়ন করিয়া কাটাইতে তাঁহার কষ্টবোধ হইত না। কলিকাতায় তাঁহার বাসায় তাঁহার হতশ্রী লক্ষ্মীছাড়া দৈন্যদশা দেখিলে সেখানে বসিতে ইতস্ততঃ করিতে হইত। দারিদ্র্য যে তাঁহাকে ভয়ংকররূপে ঘিরিয়া আছে তাহা সেই নিয়তরসপিপাসু কবিটি বোধ হয় ভালো করিয়া জানিতেনই না; আনন্দের সম্পদ তাঁহার এতই অধিক পরিমাণে ছিল।

তাঁহার বিদ্যালয়ে আত্মোৎসর্গ এক দিনেই স্থির হইয়া গেল। তাঁহার পরিবারে ঘোরতর দৈন্যদশা, পরীক্ষা দিয়া মানুষ হইলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে ইহাই সকলে আশা করিয়াছিল; তিনি এখানে আসিয়া আপনাকে নিঃশেষে দান করিলেন। অথচ সে ভাব তাঁহার মনেই ছিল না। তিনি বরাবরই ভাবিতেন যে, তিনি অত্যন্ত অযোগ্য কৃপাপাত্র— নিজের সম্বন্ধে লেশমাত্র অভিমান তাঁহার মধ্যে কোনোদিন কেহ দেখেন নাই।

কলিকাতার বাসাবাড়ির মলিন অন্ধকারপূর্ণ দারিদ্র্যময়

গৃহকোণকে যে স্বর্গলোক করিয়া রাখিয়াছিল তাহার কাছে বোলপুর তো স্বর্গেরও বাড়া। শিশু যেমন তাহার মাতৃদুগ্ধ অহোরাত্র শোষণ করিয়া বাড়ে, তিনি এই আশ্রমপ্রকৃতিকে, এই আদর্শকে, এই কর্মকে, আনন্দকে শোষণ করিয়া দিনরাত রসে মাধুর্যে ঔদার্যে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রহিলেন। না তাঁহার কাজের বিরাম ছিল, না তাঁহার রচনার বিরাম ছিল, না সৌন্দর্য-উপভোগের বিরাম ছিল। আশ্রমবালকদের মধ্যে সেই আনন্দের বিদ্যুৎসঞ্চার তিনি করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত যে, তাহারা পৃথিবীমাতার স্পর্শ পাইতেছে। বুঝা যাইত, 'Three years she grew in sun and shower' -এর কবি মিথ্যা কথা লেখেন নাই।

তাঁহার অধ্যাপনা তেজে আনন্দে আবেগে এমনি পরিপূর্ণ ছিল যে, তাহা ভাবসৃষ্টির মতো বোধ হইত। তাঁহার আনন্দ যে কী প্রচণ্ড কী প্রবল কী ভয়ংকর তাহা আমার বুঝাইবার সাধ্য নাই; কারণ দুঃখের বিষয়, আমাদের সাক্ষ্য ব্যতীত তাহার নিদর্শন সামান্য। পুঁথির শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়মনের সত্য-উদ্‌বোধন-কার্য যাহাতে হয় সেই দিকে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। সতীশের অধ্যাপনায় সেই কাজটি হইত। তিনি বাংলা পড়াইতেন— যেখানেই রচনার মধ্যে কোনো বর্ণনার আভাস আছে সেখানে তাহার স্ফুটনে বালকদিগকে লাগাইতেন, তাহারা মানসচিত্রে সমস্তটা দৃশ্যের খুঁটিনাটি আশপাশ সমস্ত দেখিতে পাইতেছে কি না তাহা যাচাইয়া লইতেন। এমনি করিয়া তাহাদের কল্পনাবৃত্তির বোধন হইত।
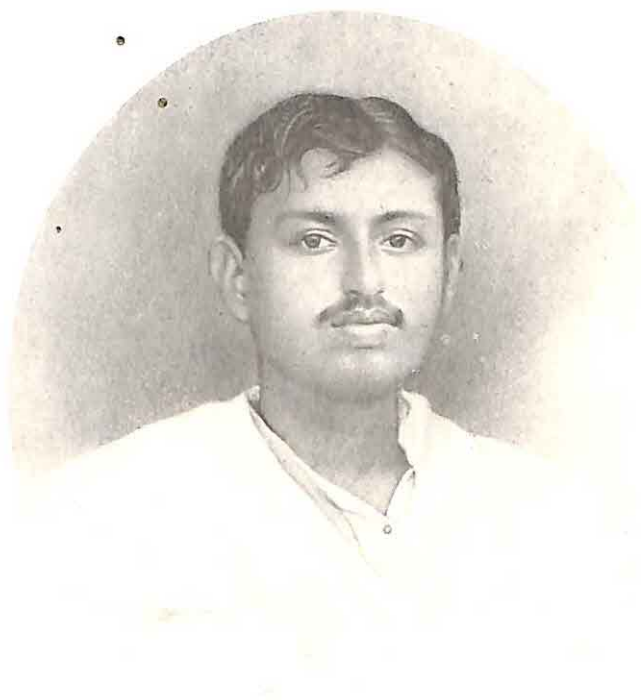
সতীশচন্দ্র রায়
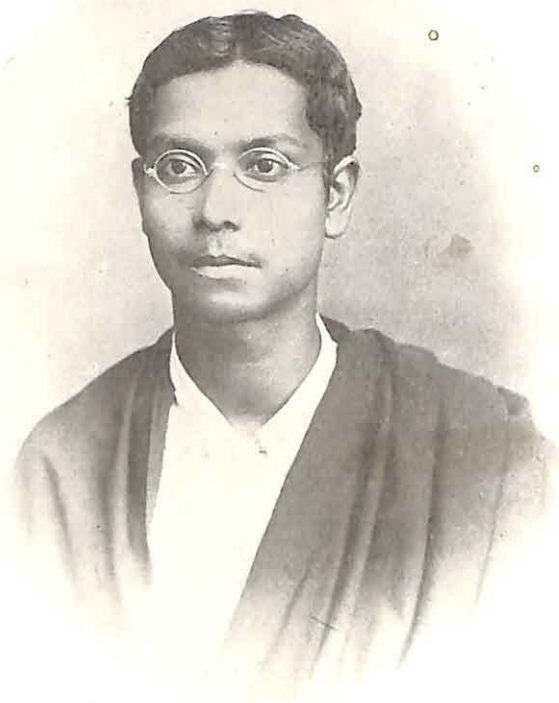
অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

ছন্দ শুনাইয়া ছন্দোবোধ এবং ছন্দ-রচনায় তাহাদের উৎসাহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাইয়া দিতেন। ভাষার মধ্যে প্রত্যেক শব্দের ধাতুগত অর্থ এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে তাহার অর্থের বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিতেন। সাহিত্য পড়াইতে গেলে যে তাহার ভিতরের আসল জিনিস রসবোধ কী করিয়া সঞ্চারিত করিতে হয় তাহা ইনি জানিতেন আশ্চর্যরূপে। প্রকৃতিগ্রন্থেও ছাত্রদের অভিনিবিষ্ট করিতে এই প্রকৃতির ভক্তটি ওস্তাদ ছিলেন। তাহাদের কাছে প্রকৃতির একটি রূপও অগোচর থাকিত না; প্রতিদিনের আবহাওয়া— সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান, মেঘবৃষ্টি, ফুলফলের উন্মীলন, পক্ষিপরিবারের নানা কথা, সমস্তই চোখের সামনে মেলা ছিল। 'কোথা গিরগিটি বাহিরিয়া আসে, মাথার জটার করাত প্রকাশে' এবং 'কোথায় গোসাপ, খরজিভ লুহি লুহি ধীরে চলে, সেথায় শুকনো পাতাগুলি-তলে'— তাহাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জানা ছিল। বর্ষায় তাহারা বাহির হইত। জ্যোৎস্না রাত্রে কে তাহাদের ঘরের মধ্যে রাখিবে। বৈশাখের ঝড়ে তাহারা ধুলায় গড়াগড়ি যাইত। তিনি তাহাদের উপভোগকে কল্পনাকে হৃদয়কে এমনি করিয়া জাগাইয়াছিলেন। 'গুরুদক্ষিণা' যদি কেহ ভালো করিয়া পড়েন তবে এই কথার পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন, কারণ ও বইটি যেন আশ্রমেরই স্বহস্তের রচনা।

অবশ্য প্রতিভা আমাদের অদৃষ্টে সকল সময় জুটিবে না তাহা

জানি, সুতরাং সেজন্য আক্ষেপ মিথ্যা। কিন্তু আমি গোড়াতেই বলিয়াছি যে, এ আশ্রমের মর্মগত সাধনা একটি আছে, যাহা ইহার আদিগুরু মহর্ষির সাধনা ছিল। সে হইতেছে, সত্যের কাছে ফলাফলবিচারহীন আত্মোৎসর্গ, অর্থাৎ নিজের অহংকে একেবারে বিসর্জন দেওয়া, নিজের দিকে কিছুই না টানিয়া রাখিয়া, সত্যের দিকে সমস্তই মেলিয়া ধরা। ত্যাগ যদি ধনের ত্যাগ বা অভ্যাসের ত্যাগ হয়, আরামের বা সুখের ত্যাগ হয়, তবে তাহা সত্য ত্যাগ হয় না, তাহা ত্যাগের বাহিরের রূপ হয় মাত্র ; কারণ সত্য ত্যাগ একমাত্র আত্মত্যাগ, আপনাকে ভোলা। সতীশের সেই আপনাভোলা ত্যাগ ছিল। সেই দিক দিয়া, প্রতিভার দিক দিয়া নয়, তিনি আশ্রমের এত ভিতরে গিয়াছেন। তাঁহাকে দিয়া আমাদের আদর্শের সত্যতা ও তাহার যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষবৎ বুঝিবার সাহায্য হইয়াছে।

উপাধ্যায়মহাশয়ের সময়ে ছাত্রগণ কঠোর নিয়মসংযমে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া বলিষ্ঠ হইবার দিকে উৎসাহ পাইয়াছিল। সতীশের সময় সে শিক্ষা পুরাপুরি ছিল, এবং সেইসঙ্গে আনন্দের শিক্ষা, বিশ্ববোধের শিক্ষা আসিয়া আশ্রমকে কেবল বাহিরের দিক হইতে নয়, ভিতরের দিক হইতে গড়িয়া তুলিল। সতীশের সহযোগীগণ অনেকেই খুব পৌরুষভাবাপন্ন দৃঢ়চরিত্রের মানুষ ছিলেন, সুতরাং অভ্যাসের দিক হইতে তাঁহারা বালকদিগকে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছিলেন। দুয়ের সামঞ্জস্যে তখন আশ্রমশ্রী চমৎকার খুলিয়াছিল।

আমি পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, উপাধ্যায়মহাশয়ের

বিদায়ের পরে মোহিতবাবু প্রভৃতি কয়েকজনে বিদ্যালয়ের চালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহিতবাবু বিদ্যালয়কে কিরূপ সাহায্য করিতেন কবিলিখিত তাঁহার স্মৃতিরচনায় আপনারা তাঁহার পরিচয় পাইবেন। বিদ্যালয়ের কিসে মঙ্গল হইবে সে দিকে তাঁহার সর্বদাই চিন্তা ছিল। তিনি পণ্ডিত ও ভাবুক ছিলেন, তিনি ইহাকে দেশের বর্তমান কালের প্রয়োজনের দিক হইতে এবং ভারতের চিরন্তন সাধনার দিক হইতে খুব বড়ো করিয়া দেখিতে পারিতেন। ১৩১০ সালের মাঘে সতীশ যখন অকালে বসন্তরোগে এই আশ্রমে মারা গেলেন তখন মোহিতবাবু তাঁহার কলিকাতার অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়া যোগ দিলেন। তখন কিছুকালের জন্য শিলাইদহে বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। মোহিতবাবু সেইখানে গিয়া বিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করিলেন।

১৩১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় বোলপুরে ফিরিয়া আসিল। তখন মোহিতবাবু অধ্যক্ষ। মোহিতবাবু শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার কাজে তখন লাগিয়া গিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি মোহিতবাবুর অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। অনেক দিন তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'কলেজে যত দিন পড়িয়াছি ততদিন কিছুই শিখি নাই, কলেজ হইতে বাহির হইবার পরে বিদ্যামন্দিরের মধ্যে একটু আধটু প্রবেশ লাভ করি।' এ বিদ্যালয়ে আসিয়া তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল এই যে, য়ুরোপ হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাকে আমরা আমাদের জ্ঞান-

লাভের প্রণালীর ভিতর দিয়া কী উপায়ে পাইব। তিনি পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া পুঁথির শিক্ষার খুব ফলাও আয়োজনের দিকে তাঁহার স্বভাবতঃ ঝোঁক ছিল। তিনি যে পাঠ্যসূচী তৈরি করিয়াছিলেন তাহা যদি আজ থাকিত তবে আপনারা দেখিতে পাইতেন যে, সেরূপভাবে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষকের কী পরিমাণ বিদ্যাবুদ্ধি আবশ্যক। সকল বিষয়েই খুব বড় রকমের আয়োজন মোহিতবাবু খাড়া করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় মোহিতবাবু ছেলেদের গল্প বলিতেন। বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতেই সন্ধ্যার অবকাশকাল এখানকার ছেলেরা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণ ও ইতিহাস -কথা শুনিয়া যাপন করে। নিজেরা একটা প্লট খাড়া করিয়া হেঁয়ালি-নাট্য রচনা করিয়া কখনো কখনো অভিনয় করিয়া থাকে। পূর্বে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধচর্চাও হইত। চট্ করিয়া চোখে দেখিয়া একটা জিনিসের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বলা, হাতে অনুভব করিয়া কোনো জিনিসের ওজন বলা, অনেকগুলো জিনিস এক পলকের মধ্যে দেখিয়া কতগুলি এবং কী কী দেখিয়াছে তাহা বলা, ইত্যাদি উপায়ে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করানো হইত। জগদানন্দবাবু, সুবোধবাবু, সত্যবাবু প্রভৃতি সন্ধ্যার এই অবকাশ ছেলেদের গল্পে গানে আমোদে প্রমোদে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

কিছু কাল এইভাবে চমৎকার চলিল। কিন্তু মোহিতবাবু পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া এবং বরাবর যেভাবে অন্যত্র কাজ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে বাহিরের কোনো আয়োজনের অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে পীড়া দিত। তিনি বড়ো ছেলেদের ভর্তি

করিতে লাগিলেন এবং অনেক ছেলে ভর্তি করিয়া বিদ্যালয়কে হঠাৎ বড়ো করিবার দিকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বয়স্ক ছেলের দল জুটিল, ছাত্রসংখ্যাও কুড়ি-পঁচিশটি হইতে প্রায় পঞ্চান্নটিতে গিয়া ঠেকিল। মোহিতবাবুকেই তখন বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ দেখিতে হইত, হিসাবপত্রও রাখিতে হইত। যিনি চিরকাল দর্শন ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে হঠাৎ ভাঁড়ারে রান্নাঘরে অষ্টপ্রহর টানাটানি করিয়া কোনো বিশেষ লাভ হইল না। তা ছাড়া তিনি এমন অমায়িক ও শিশুপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে সব দিককার রাশ বাগাইয়া চলিতে একেবারেই অক্ষম ছিলেন। সুতরাং দার্শনিক পণ্ডিত এবং উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ ব্যবস্থাপক এবং সুদৃঢ় কর্তা না হইতে পারায় নানা দিকে গোলযোগ বাধিল। অনেক ছেলে হইল, তাহাদের ব্যবস্থিত করিবার শক্তি ছিল না, অধ্যাপকগণের মধ্যেও যোগবন্ধন দৃঢ় হইল না। বিদ্যালয়ের হঠাৎ-বৃদ্ধিটা একটা অমঙ্গলজনক ব্যাপার হইল।

মোহিতবাবু অনুভব করিলেন যে, বিদ্যালয়কে বিদ্যার দিক দিয়া তিনি যে ভাবে পূর্ণাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এ অবস্থায় সম্ভাবনীয় নহে। তাহার একটা প্রধান কারণ, সকলেই এক আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়। বরাবর এখানে এই একটি প্রতিকূল অবস্থা থাকিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, এটা ইস্কুলও বটে, আশ্রমও বটে। যেখানে ইস্কুল সেখানে পড়াইবার মাস্টার চাই, অথচ মাস্টার হইলেই যে তিনি গুরু হইবেন এমন কোনো কথা নাই। এ স্থলে রবীন্দ্রবাবু

লিখিয়াছেন, 'এ কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ··[ইস্কুলের] শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে।' এ কথা আংশিক-ভাবে সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই 'স্বভাবতই'টার ব্যতিক্রমও ঘটে, দাবি করিলেও দাবি মিটানো অনেকের পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব হয়। তখন হয় তাহাকে ভড়ং করিতে হয়, নয় সত্য দাবি মিটাইতে গিয়া সে আদর্শকে নিজের ক্ষুদ্রতার দ্বারা ম্লান করিয়া বসে।

যাহাই হউক, মোহিতবাবু বুঝিলেন যে, বিদ্যালয়ের অন্তরতর স্থানে আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ইহার পর একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় গেলেন কিন্তু সুস্থ হইয়া আর বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন না, বাহির হইতে যোগ রাখিলেন। ১৩১১ সালের মাঝামাঝি তিনি বিদ্যালয় ছাড়িলেন।

মোহিতবাবুর যাইবার সময়ে বিদ্যালয়ে খুব একটা বড়ো রকমের ভাঙচুর হইয়া গেল। তখন এমন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে সকলেরই মন দোলায়মান ছিল যে, অনেকেরই মনে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছিল।

ইহার পর রবীন্দ্রবাবু স্বয়ং আসিয়া বিদ্যালয়ে বাসা বাঁধিলেন। তিনি স্থায়ীভাবে এখানে থাকিয়া সকল কর্মের

ভার লইবার জন্য এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁহার যোগ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইবার জন্য বিদ্যালয়ের মাথার উপর হইতে সংশয়ের মেঘ একটু একটু করিয়া কাটিতে লাগিল। অধ্যাপকদিগের প্রত্যেককে অধ্যয়নে অনুশীলনে ও রচনাকার্যে উৎসাহ দিলেন, যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ তাঁহাকে সেই বিষয়ে পুস্তক আনাইয়া দিয়া পরামর্শ দিয়া আলোচনা করিয়া সেই অনুরাগকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া দিলেন। অধ্যাপকগণকে লইয়া একটি সায়ংসভা গঠিত করিলেন, তাহাতে নানা বিষয়ে আলোচনা এবং পাঠ হইত। সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্রধর্ম সকল বিষয়ে পাঠ এবং কথাবার্তা হইত, তাহার কিছু কিছু রিপোর্ট আমাদের পরলোকগত বন্ধু সত্যেন্দ্রবাবু রাখিয়াছিলেন। হয়তো কোথাও-না-কোথাও সে খাতাগুলি এখনও আছে।

ক্লাসে ক্লাসে গিয়া রবীন্দ্রবাবু বসিতেন এবং নিজে পড়াইয়া কী ভাবে ভালো পড়ানো যাইতে পারে তাহা দেখাইতেন। ইংরেজি বাংলা দুই ভাষাই তিনি নিজে কোনো কোনো ক্লাসে পড়াইতেন। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপকদিগের সহিত পাঠপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

এখানে আমার একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ বিদ্যালয়ে একটি ভাব ইহার আরম্ভকাল হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, এখানে অধ্যাপকদের মধ্যে কোনো উচ্চনীচের অসামঞ্জস্য নাই। সেইজন্য কাহাকেও হেড্‌মাস্টার বা কর্তৃপদ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য রবীন্দ্রবাবু নিজে ভারগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবটি কিছু কিছু আঘাত পাইয়াছিল। কবি নিজে

কোনো দিন কোনো অধ্যাপককে অনুভবমাত্র করিতে দেন নাই যে, তিনি প্রভু এবং অধ্যাপকেরা তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখিবেন। তিনি বরং বরাবর যে আসনটি কামনা করিয়া আসিয়াছেন সে আসনের প্রতি আমাদের কাহারও কোনো লোভ বা আকর্ষণ থাকিবার কোনো কারণ নাই। তাঁহার ভাব এই যে, আমরা সকলে মিলিয়া বিদ্যালয়ের কাজ করিতেছি— ছাত্র এবং অধ্যাপক এবং স্থাপয়িতা সব আমরা এক জায়গায় বসিয়া গিয়াছি। সুতরাং অধ্যাপক কেবল শাসন করেন, ছাত্র শাসিত হয়; অধ্যাপক উচ্চে, ছাত্র নীচে; এ ভাবটিও এ বিদ্যালয়ের ভাব নয়। কারণ বয়সে জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় অধ্যাপক বড়ো হইলেও সাধনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান, সেখানে সকলেই সকলের সহায় ও বন্ধু। বিদ্যালয়ের সকলের মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধটি যাহাতে স্থাপিত হয় তজ্জন্য এখানে প্রত্যেককেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে হয়, কী করিয়া সকলের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠতর হয় সেই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এখানে কাহারও কাজ মাথার, কাহারও কাজ হাতের, কিন্তু তাই বলিয়া কোনো অঙ্গের সঙ্গে কোনো অঙ্গের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নাই— সবাই যে এক-কলেবরবদ্ধ এ বোধের কোথাও ব্যত্যয় নাই। ইহার অনেক দিকেই অনেক অসুবিধা আছে তাহা জানি। কিন্তু তথাপি এ ভাবকে না রক্ষা করিলে আশ্রমের আদর্শই পীড়া পায়; আশ্রম আর আশ্রম থাকে না, তাহা আপিস হইয়া দাঁড়ায়। তখন মঙ্গলের স্থানে যন্ত্রের আবির্ভাব হয়।

১৯০৭ খৃস্টাব্দে যে বালকগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা বিদ্যালয়ের এই ভাবটিতে বর্ধিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তাহারা উচ্চ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অনেক দূর পর্যন্ত অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিয়াছিল। রবীন্দ্রবাবু নিজে কিছুকাল ইহাদিগকে সাহিত্য পড়াইয়াছিলেন।

ইহা হইতে আর-একটি জিনিস বিদ্যালয়ের চোখের সামনে দেখা দিল। ছেলেদের লইয়া যে সকলরকম আলোচনাই করা যায় এবং তাহা যে তাহাদের মনের পরিণতির পক্ষে খুবই সহায়তা করে সে কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা ছেলের মনোরাজ্যের সকল খবর রাখেন না। অসংহত জ্যোতির্বাষ্পে এবং পিণ্ডীকৃত সংহত তেজঃপুঞ্জ নক্ষত্রে, অর্থাৎ নেব্যুলাতে এবং নক্ষত্রে যে প্রভেদ বালকের মনে এবং পরিণত মনে কেবল সেই প্রভেদ। কিন্তু তাই বলিয়া কি এই কথা বলিতে হইবে যে, যেহেতু জ্ঞানের ও অনুভূতির বিষয়-সকল তাহার মনের মধ্যে সংহত আকার প্রাপ্ত হয় না, ছাড়া-ছাড়া ভাবে বিক্ষিপ্ত এবং আবছায়া ভাবে থাকে, অতএব তাহার বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনাবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তিকে কেবল রাঙা ছবি আর আরব্যোপন্যাস দিয়া ভুলাইতে হইবে, আর তাহার চেয়ে বড়ো কিছুই দেওয়া হইবে না, কারণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে সে সমস্তই তাহার ধারণার অগম্য? সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া অন্তত আমাদের সংস্কারের সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া দেখিবার কি কোনো প্রয়োজন নাই। য়ুরোপে ও আমেরিকায় অনেক স্থানে এখন উচ্চ অঙ্গের ইংরেজি সাহিত্য

হইতে বালকোপযোগী অংশ-সকল চয়ন করিয়া পড়ানো হয়—খুব নীচের ক্লাশেই শেক্সপিয়র রস্কিন ওআর্ডসওআর্থ প্রভৃতি পড়ানো হইতেছে। ইতিহাস ভূগোল মিশাইয়া সমস্ত জগৎ-সভ্যতার ক্রমবিকাশ শিশুদের কাছে দিবার চেষ্টা হইতেছে। বিজ্ঞানের সকল ব্যাপার সাধারণ-বোধগম্য করিবার জন্য বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক মহারথীও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। হেল্‌ম্‌হজ টিণ্ডাল লাবক্‌ প্রভৃতি সেই কার্যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডে জর্মানিতে ও আমেরিকায় যদি শিশুকে শিশু বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া রাঙা ছবি দিয়া ভুলানো না হয় তবে আমরাই কেন শিক্ষাকে কেবল নীরস ও শুষ্ক করিয়া রাখিব তাহা তো বুঝি না। সার অলিভার লজের ন্যায় কড়া বৈজ্ঞানিকেরও SCHOOL TEACHING AND SCHOOL REFORM-নামক গ্রন্থে এই কথা লেখনীতে বাহির হইয়াছে যে, শিক্ষার আদর্শ কেবল খবর দেওয়া নহে, কিন্তু মানসশক্তির উদ্‌বোধন করা; সুতরাং ক্রমাগত সকল বিষয়েই দেখিতে হইবে যে, অধীত বিদ্যা বিদ্যার্থীর স্বকীয় জিনিস হইতেছে কি না, অর্থাৎ তাহার উপরে তাহার এমন দখল জন্মিতেছে কি না যাহাতে সে তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে পারে। সাহিত্য পড়িয়া যদি রসবোধ না হয়, বিজ্ঞান শিখিয়া যদি অনুসন্ধিৎসা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রবৃত্তি না জন্মে, তবে কী শিক্ষা হইল।

যাহাই হউক, বিদ্যালয় তখনকার ছাত্রদের অনেক জিনিস নির্বিচারে দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, যদিও তাহাকে বেশ সুবিহিত প্রণালীর মধ্যে বদ্ধ করিতে পারে নাই।

এমন সময়ে ১৩১২ সালে সমস্ত বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সে আন্দোলনে বিস্তর সাময়িক উন্মত্ততা ঘটিলেও দেশ যে কত বড়ো সত্তা, তাহার আকর্ষণ যে কী প্রচণ্ড, সংসারের স্বার্থ খ্যাতি প্রতিপত্তির আকর্ষণ যে তাহার কাছে কতই সামান্য, এই একটি নূতন অনুভূতি সকলকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। এই ভাবের বাষ্প দেশের আকাশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহা আমরা উপাধ্যায়মহাশয়ের কথাতেই দেখিয়া আসিয়াছি। তবে সেই বিক্ষিপ্ত বাষ্প যে এমন করিয়া জমাট বাঁধিয়া হঠাৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখিতে দেখিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তাহা কেহই কল্পনা করেন নাই। যাহাই হউক, শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বন্দরে দেশের চিত্তসমুদ্রের এই ক্ষুব্ধ ঝটিকার তরঙ্গের অভিঘাত লাগিবার কোনো কারণ ছিল না, সাময়িকতা সেখানে বারম্বার প্রতিহত হইল।

শান্তিনিকেতন তাহাকে ফিরাইল বটে, কিন্তু শান্তিনিকেতনবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই শান্তিনিকেতনের শান্তং শিবং অদ্বৈতং -এর সাধনা এমন করিয়া গ্রহণ করেন নাই যাহাতে তাঁহাদের পক্ষে দেশকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল। অবশ্য যখনই তাঁহারা সংযমের রাশকে আলগা করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, শান্তিনিকেতনের তর্জনী তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছে। কিন্তু তখন যে তাহা অনেক সময়েই ভালো লাগে নাই এবং অনেক সময় বিরোধ জাগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

তাহার কারণ ছিল। তখন মনে করিতাম যে, সমস্ত দেশকে সমাজকে ছাড়িয়া যে ধর্মের সাধনা সে অত্যন্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট অর্থাৎ বস্তুবিচ্ছিন্ন সাধনা। চারিদিককার সমস্ত শক্তির তরঙ্গলীলা হইতে দূরে নিভৃতির মধ্যে বন্দর গড়িয়া বাস করার মধ্যে একটা ভীরুতা আছে। তাহার যেন আপনার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহস নাই, ভরসা নাই— তাহার প্রাণ এতই ক্ষীণ। এমনতরো অপবাদ কোনো কোনো মহলে প্রচারিতও হইয়াছিল যখন রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া কিছু দিন বাদে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। অনেকে বলিয়াছিলেন যে, এরকম ধর্ম শৌখিন ধর্ম, পাছে কোথাও সংসারের আঁচ লাগে এই ভয়ে ভয়ে সে পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়। ভালোমন্দ পাপপুণ্য সমস্তের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া যদি বলিতে পার যে, এখানেও স্বর্গের আনন্দ স্বর্গের গন্ধ পাইতেছি, তবেই বুঝি ধর্ম সত্যপদার্থ হইয়াছে।

তখন আমরা নিজেরাই এসকল কথা এই দিক হইতে ভাবিয়াছি এবং অধীর হইয়াছি। এখন উত্তেজনার অবসানে দেশই ক্রমে এই কথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আন্দোলনের সময়ে সে দেশেরই বিপরীত সাধনাকে বড়ো করিয়াছিল। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সভ্যতার মর্মগত একটি মনুষ্যত্বের আদর্শ আছে, যাহাকে সে নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, নানা পরীক্ষা আন্দোলন উদ্যোগ বিপ্লব যুদ্ধের মধ্য দিয়াও ক্রমশ উপলব্ধি করিয়া থাকে। য়ুরোপ সেই আদর্শের নাম

দেয় ফ্রীডম। তার মানে, যে-কোনো মানুষ মনুষ্যত্বের সকল অধিকারে অধিকারী হইবে। কিন্তু য়ুরোপ আজও মনুষ্যত্বের অধিকার বলিতে বাহ্য অধিকার, বিষয়ের অধিকারই বুঝিয়া থাকে। ইউনিভার্সাল সাফ্রেজ মানে সকলের ভোটের সমান অধিকার, রাষ্ট্রতন্ত্রে অধিকার, সুতরাং য়ুরোপের ভিতরের সকল চেষ্টাই পোলিটিকাল ভিত্তির উপর ভর করিবার প্রয়াস পায়। আমাদের দেশের মর্মগত আদর্শ স্বতন্ত্র; সে চায় ভিতরের ফ্রীডম— বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তি। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্— তাহার এই বুলি। সে তাই পরিবারকেও বলে বন্ধন, সমাজকেও বলে বন্ধন, রাষ্ট্রকেও বলে বন্ধন, এবং নেশনকেও যে সে পরমপদার্থ বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিবে তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই। মায়াবাদী ভারতবর্ষ মায়াকে কেবলই ছেদন করিয়া করিয়া সমগ্রকে আত্মাকে উপলব্ধি করিবে; তাই সে বলে যে, একটি একটি করিয়া কোষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে হইবে। আত্মা প্রজাপতির মতো নানা অবস্থার মধ্য দিয়া যাইবে, কোনো গুটিই তাহার শেষ আশ্রয় হইবে না। চতুরাশ্রম এইজন্য তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং আজও করিতেছে; যদিও তাহার সমাজ এখন দ্বিজত্বকে জন্মের জিনিষ করিয়াছে, সাধনার জিনিষ নয়, এবং ব্রহ্মচর্যকে তিন দিনের ব্যাপার করিয়া একটিমাত্র আশ্রমকেই যত সকালে আশ্রয় করিয়া বসা যায় তাহার উপায় স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সংসারে ঢুকিলেই তাহার পরমা তৃপ্তি, ইহাই তাহার পরমলোক, ইহাই

তাহার পরমানন্দ। এইখানে শেষ দিন পর্যন্ত কড়ি জমাইয়া কড়ি গুনিয়া মরাই বর্তমান সমাজের পরম পুরুষার্থ। তথাপি এই আদর্শ যখন আমাদের সভ্যতার মর্মগত আদর্শ তখন এই দিক দিয়াই শিক্ষাকে সমাজকে, সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যোগকে গঠন করিতে হইবে, মুক্তির দিক দিয়া ধর্মের দিক দিয়া সব গড়িতে হইবে— সমস্ত সাধনাই সেই ধর্মলাভের সাধনা, তাহারই সোপান-পরম্পরা হইবে। শান্তিনিকেতনের ইহাই আদর্শ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে এই আদর্শ কাজ করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাই যখন দেখি যে, তিনি সমস্ত জীবনের সকল কর্মকেই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন, অথচ তাহার রূপটি কোনো-মতেই বৈদেশিক হইতে দেন নাই—আমাদেরই দেশীয় রূপ রক্ষা করিয়াছেন যথাসম্ভব। অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে উপনয়নে বিবাহে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠেয় ব্যাপারকেই এমন করিয়া প্রাচীনের সঙ্গে সংগত করিয়া অথচ তাহার অগ্রহণীয় অংশকে পরিবর্জন করিয়া লইয়াছেন যাহাতে তাঁহার আদর্শ যে কী ছিল তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বাকি থাকে নাই। তাই দেশকে জানা এবং সেবা করা যে ধর্মকে বাদ দিয়া কেবল উত্তেজনা ও উন্মত্ততাকে বিস্তার করিয়া হইবে না, আন্দোলনের অবসানে সে কথা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনে যেসকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান জাগিল তাহা যে অল্প সময়েরই মধ্যে প্রাণহীন ও নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে, সে কি কেবল উৎসাহের অভাবে। আমি বলি ধর্মের অভাবে, চরিত্রের অভাবে, ভারতবর্ষের যথার্থ সাধনার সঙ্গে যোগের

পিছনের সারি, বাম দিক হইতে। রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, মনোমোহন চক্রবর্তী ;
সম্মুখের সারি, অজিতকুমার, সতীশচন্দ্র, শিবধন বিদ্যার্ণব, কুঞ্জলাল ঘোষ, নরেন্দ্র ভট্টাচা

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ। ১৩১০ ?

অভাবে। আমাদের বুদ্ধির সূক্ষ্ম নৈয়ায়িকতা যাহা মিথ্যাকেও সত্যের পোশাক পরাইতে লজ্জিত হয় না, আমাদের ভেদবুদ্ধি যাহার নির্লজ্জ মূর্তি এই আন্দোলনেই সর্বাপেক্ষা চোখে পড়িয়াছে, ব্যবধান নূতন করিয়া শক্ত করিয়া এবং পাকা করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, এবং আমাদের চরিত্রের একান্ত অভাব যাহা মিলিতে পারে না মিলাইতে পারে না, আপনাকে খর্ব করিতে জানে না, স্বার্থ ও বিদ্বেষবুদ্ধিকেই আঁকড়িয়া থাকে— প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে এইসকল পাপ কি জাগে নাই এবং তাহারই বিকারফল কি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি না। কোনো উদাহরণে প্রয়োজন নাই, নিজেদের দিকে তাকাইলেই উদাহরণ মিলিবে এবং আপনারা সকলেই আমার কথার সাক্ষ্য দিবেন।

জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হইবার প্রস্তাব সেই সময়ে চলিতেছিল। নানা কারণে তাহা হয় নাই। হইলেও ভালো হইত কি না সন্দেহ। কারণ, জাতীয় বিদ্যালয় যে ভাব হইতে উঠিয়াছে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমের জন্ম সে ভাব হইতে হয় নাই, তাহা আমি প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছি। আমি তো ১৩০৮ সালে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই কথা বলিতেই নারাজ। আমি বলি যে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমই পূর্বে ছিল, কালের গতিকে এবং অসম্পূর্ণতার বেদনায় বিদ্যালয় তাহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে মাত্র।

অথচ ১৩১২-১৩ সালে বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যে এমন একাত্ম সেই অত্যন্ত সত্য কথাটাই আমরা ভুলিয়াছিলাম। সুতরাং উত্তেজনা হইতে বাধা পাইয়া ডিসিপ্লিন জিনিসটাকে

মঙ্গলচর্যার স্থানে রাজা বলিয়া আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতে হইল। ১৩১৩ হইতে ১৩১৪ ও ১৩১৫এর আরম্ভ পর্যন্ত এই একটা কঠোরতার পর্ব চলিল। বিধাতার সৃষ্টি যে কী তাহা আমরা জানি নাই— আমরা ছোটোখাটো প্রবালদ্বীপ রচনা করিতে বসিয়া গেলাম।

অধ্যাপকগণের মধ্যে তিনজন অধিনায়ক হইলেন, ছাত্রদের মধ্যেও নায়কতার নির্বাচনপ্রণালী প্রবর্তিত হইল। প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত নিয়ম নিয়ম নিয়ম, বাঁধাবাঁধি কৃত্যাকার্য বিচার দণ্ডবিধান— সব কড়াক্কড় রকম ব্যবস্থা হইল। সুখ আরাম কোথায় গেল, তাহাকে কঠোরতার চাপে একেবারে পিষিয়া মারিয়া ফেলা হইল।

তখন অধ্যাপকগণ হয় দেশের সেবার ভাবে উদ্‌বোধিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কিম্বা ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারেই হয়তো সকলেই এই ডিসিপ্লিনের জীবনটাকেই বড়ো জীবন বলিয়া বোধ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন উগ্র নীতি-পরায়ণ ছিলেন যে, ছেলেদের উপর ক্রমাগত নীতি বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া এবং তাহার সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর আলোচনা করা তাঁহারা কর্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। ছেলেরাও বাহির হইতেই সব বিষয়ে সাড়া দিত, কিন্তু তখনকার আব-হাওয়া যে খুব নির্মল উদার ছিল এমন তো মনে হয় না। একটি কথা তখন ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছিল যে, বাহিরের নিয়মে মানুষ গড়ে না, তাহাতে মানুষ বড়োজোর নীরস ও আচার-পরায়ণ মাত্র হয়; ভিতরের শক্তির পূর্ণ উদ্‌বোধন না হইলে

নিয়মের নিগড় নিগড়ই থাকিয়া যায়, তাহা আনন্দের জিনিস হয় না। নিয়ম তো থাকিবেই, কিন্তু তাহার রূপ আনন্দের রূপ হওয়া চাই— সে যেন আনন্দেরই বাহিরের প্রকাশ হয়।

সেই আনন্দ আমাদের মধ্যেই তখন ছিল না। আমরা ভিতরের অভাব বাহিরের উগ্র কর্মপরায়ণতার দ্বারা চাপা দিয়া নিজেকে ভুলাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। আমরা তখন এমন-সকল নিয়ম ও অনুষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম যাহা বাহ্য কঠোরতার একেবারে চূড়ান্ত। ছেলেরা বাসন মাজিত, রান্না-ঘরের কাজ করিত, দরিদ্রসেবা করিত, ভুবনডাঙা গ্রামের শিক্ষা ও চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। প্রত্যহ বৈকালে কয়েকটি স্বেচ্ছাব্রতী বালক ভুবনডাঙা গ্রামে গিয়া সেখানকার ছেলেদের পড়াইত। আর কয়েকজন তাহাদের ঘরে বসিয়া রোগীদের হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিত। সন্ধ্যায় অধ্যাপকগণ পালাক্রমে গ্রামবাসীদিগকে একত্র করিয়া মহাভারত রামায়ণ ও ইতিহাসের কথা শুনাইতেন। প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত এই গ্রামের কাজ চলে। গ্রামের এ কাজ যে চেষ্টার শৈথিল্যের জন্য সফল হয় নাই তাহা নহে, গ্রামবাসীগণ এ সম্বন্ধে এক বৎসর নিয়মিত কার্য সত্ত্বেও একদিনের জন্যও উৎসাহ বোধ করে নাই এবং ইহাতে তিলমাত্র আগ্রহ দেখায় নাই। গ্রামের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হিন্দু মুসলমান উভয়ে কোনো বিষয়েই মিলামিশা নাই— হিন্দুর মধ্যে হাড়ি ডোম ভিন্ন আর কোনো বর্ণ নাই এবং তাহাও স্বল্প কয়েকটি ঘর। ছেলেরা গ্রামের সকল বিষয়ে স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ লইয়াছিল,

দরিদ্রদের ঘর ছাইয়া দিয়াছিল, সকল গ্রামবাসীর পরিচয় লাভ করিয়াছিল — এজন্য ছেলে এবং অধ্যাপক সকলেরই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমার তো খুব মনে হয় যে, ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া এইরকম মনুষ্যসেবার কাজ এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটা অঙ্গ বরাবরই হওয়া উচিত। পশ্চিমদেশীয় ধর্মবিদ্যালয় মাত্রেই পরসেবার কাজ একটা বড়ো অঙ্গ। ব্যাপ্‌টিস্ট, মেথডিস্ট, ইউনিটেরিয়ান সকল ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে যুবকেরা গ্রামে গ্রামে লণ্ডনের স্লাম্‌স্‌-এ কাজ করিতে যায়। য়ুরোপে হ্যুম্যানিটি কথাটা যে একটা কাব্যের কথামাত্র নয়, এবং আমাদের দেশের মতো তাহার চর্চার ক্ষেত্র সেখানে যে কেবল আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তাহা সম্প্রতি হোম্‌স্‌-প্রণীত LONDON POLICE COURTS -নামক একটি পুস্তক পড়িলে এক মুহূর্তে স্পষ্টই বুঝা যাইবে। য়ুরোপ যে কোথায় আমাদিগকে জিতিয়া আছে তাহা আমাদের বোধগম্য হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। জ্ঞাতিগোষ্ঠী ছাড়াইয়া স্বদেশবাসীর প্রতি প্রীতি ও তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াসের ভাব খানিকটা বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ের দ্বারা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এ জিনিসটা, এই পরসেবার ভাবটি, আধুনিক বিদ্যালয়ের মর্মগত জিনিস হওয়া চাই। আমাদের প্রাচীন আশ্রমে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মকতা ছিল আশ্রমের ভিতরকার জিনিস, তখন মন্ত্র ছিল এই—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

অগ্নিতে জলেতে বিশ্বভুবনে যিনি অনুপ্রবিষ্ট, ওষধিতে বনস্পতিতে যিনি, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার।

অগ্নি-জলের সঙ্গে তখন প্রত্যক্ষ ব্যবহারের নিত্য পরিচয়, ওষধি-বনস্পতির সঙ্গেও তাই; সুতরাং তাহাদের মধ্যে আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়া বিশ্ববোধে পূর্ণ হইয়া বিশ্বকেও ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে আবৃত করিয়া দেখা তখনকার কালের বিশেষ সাধনা। এখনকার কালে সে মন্ত্রও বলবৎ, কিন্তু তার সঙ্গে একটুখানি নূতন মন্ত্র যুক্ত হইয়াছে এই— যে দেবতা ধনীর মধ্যে নির্ধনের মধ্যে সমভাবে আছেন, যিনি বিশ্বমানবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি দারুণ দুর্গতি ও পাপের মধ্যে, তাঁহাকেই বারম্বার নমস্কার করি। এ মন্ত্র পশ্চিমের। পূর্বদেশকে এ মন্ত্র লইতেই হইবে, নহিলে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব এ দুয়ের শুভ মিলন কোনোদিন ঘটিবে না।

আমি যে কথাটি লিখিলাম এই কথাটিই বিশেষভাবে অনুভব করিয়া একদা রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। দেশকে ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিলে তাহাকে তাহার প্রকৃত স্থানে দেখা যায় না, ভাবুকের ভাব ক্রমাগত অভাবের দিকে অন্ধ থাকিয়া তাহার উপরে নিজের কল্পিত ভাব আরোপ করিতে থাকে; বালবিধবাকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইয়া তাহার চিরজীবনের বেদনাটাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়, যাহা অন্যায় তাহাকেও এমনি পোশাক পরায় যাহাতে তাহা কল্যাণের রূপ ধারণ করে। সেই ভাবুক— সুতরাং দেশকে সে যতই ফাঁপায় ততই তাহাকে চিনিবার

পক্ষে এবং তাহার সেবা করিবার পক্ষে সে অযোগ্য হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ইহাই অনুভব করিয়া এক সময়ে স্বাদেশিকতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বোধ হয় ১৩১৫ সালে।

ইহার একটুখানি ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস 'গোরা' উপন্যাসে কবি খোলসা করিয়া দিয়াছেন। নিজের জমিদারিতেই গ্রাম্যসমাজের সংশোধনকার্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে সর্ব বিষয়ে সুদৃঢ় ঐক্য ও সহযোগিতার ভাব বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিতে আমাদের গ্রাম্যজীবনের গুরুতর দুর্গতিগুলি তাঁহার চক্ষে পড়িল। একবার হিন্দুপাড়ায় আগুন লাগাতে গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগুন নিবায় নাই, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হা-হুতাশ করিতেছিল, তাহাদের চাবুকের হুকুম দেওয়া হইল; শেষে মুসলমানপাড়ার লোকেরা আগুন নিবাইয়া দিয়া গেল এবং হিন্দু প্রজারা আক্ষেপ করিতে লাগিল যে, প্রথমেই কেন চাবুক মারা হয় নাই! এইসকল দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে আমাদের মনুষ্যত্ব কোন্ তলায় তলাইয়া গেছে, শক্তি কী মৃতপ্রায়। সুতরাং যে ভেদবুদ্ধি ও কৃত্রিম সংস্কার এই মনুষ্যত্বকে চাপিয়া মারিয়াছে এবং মারিতেছে তাহা যে দেশকে কখনোই বড়ো করিতে পারে না, এ কথা নিশ্চিতরূপে জানাতে ভাবুকতা দিয়া মেকিকে আসল বলিয়া আর চালানো সম্ভবপর হইল না।

সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে এ বিদ্যালয়ে কবি, বিদ্যার্থীদিগের চিত্ত যাহাতে সংস্কারমুক্ত হইয়া উঠে, যাহাতে অন্যায়কে অন্যায় বলিতে এবং আঘাত করিতে তাহারা বুদ্ধি এবং হৃদয়ের দিক

হইতে কোনো বাধা না পায়, সেইরূপ শিক্ষা ও উপদেশ দিবেন। পূর্বে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে অন্যরকম করিয়া ভাবিতেন, সেইজন্য দেশাচার ও লোকাচার বিদ্যালয়ের আদর্শের দিক হইতে বাধা পাইত না, বরং খানিকটা প্রশ্রয় পাইত। এই সময়ে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতে হইল যে, এ বিদ্যালয় এমনভাবে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন যাহাতে ছাত্রগণের মন সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারে, স্বাধীনভাবে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ও আলোচনা করিয়া দেখিতে পারে, সুতরাং সামাজিক আচার-লঙ্ঘনের অপরাধ এ বিদ্যালয়ে দণ্ডিত হইবে না।

এ প্রশ্ন এখানে ওঠা স্বাভাবিক এবং এই ব্যাপারটি ঘটিতে তাহা উঠিয়াওছিল যে, তাহা হইলে এ আশ্রম সাম্প্রদায়িক আশ্রম হইল, ইহাতে সকল সম্প্রদায় সকল ভাবের লোক আর তাহা হইলে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু সত্যের কি কোনো সম্প্রদায় আছে। আমি যদি বলি যে, পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, ইহা সত্য এবং প্রমাণ করিয়া দি, তবে কি তাহা সকল দেশের সকল বুদ্ধিমান মনুষ্যের সত্য হইবে না? আচার অনুষ্ঠান ও সমাজের বৈষম্য জগতে আছে এবং থাকিবেই, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ও থাকিবেই। কিন্তু যদি এমন কোনো আচার অনুষ্ঠান থাকে যাহা স্পষ্টতই অন্যায়, যাহাকে যুক্তি হৃদয় ধর্ম কোনো দিক দিয়াই ভালো বলা যায় না, তবে তাহা যে বর্জনীয় এ কথা বলিলেই কি সাম্প্রদায়িক হইতে হইবে। আমি যতদূর বুঝি, আশ্রম সেই স্থান যেখানে সকল দেশের, সকল সমাজের,

সকল মনুষ্যের সর্বোচ্চ সত্য জ্ঞানে চিন্তিত হইবে, হৃদয়ে অনুভূত হইবে এবং নানা উৎসবে অনুষ্ঠানে পরিকীর্তিত হইবে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই নিজের নিজের পার্থক্য লইয়া সেখানে মিলিয়া থাকিতে পারিবেন, কারণ সেখানে তাঁহারা সকলেই সত্যান্বেষী, সত্যের সেবক।

একটা উদাহরণ দিই। রামমোহন রায়কে মুসলমানেরা মৌলবী বলিত, খৃস্টানেরা খৃস্টান বলিত। তাহার কারণ, তিনি সকল সভ্যতার ভিতরের সত্য জিনিসটি দেখিতে পাইতেন। অথচ তিনি নিজেকে চিরকাল হিন্দুই বলিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহার ধর্ম আচার অনুষ্ঠানের বিশেষত্বটুকু হিন্দুর নিজস্ব। এই বিশেষত্বটুকু লোপ করিয়া দিবার জিনিস নহে, অথচ উদার মনুষ্যত্ব এবং সমদৃষ্টির ইহা অন্তরায় না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। যেমন 'আমি'। আমি আমিই, তুমি নই বা তৃতীয় ব্যক্তি নই। আমার মধ্য দিয়াই আমার অভিব্যক্তি, সেই আমার বিশেষ রূপ। অথচ আমার অভিব্যক্তি কি কখনও এমন হইবে যাহা সকল মানুষের নিজের জিনিস হইবে না; আমি যদি কবি হই তবে এমন কাব্য কি আমি লিখিব যাহা সকলে মিলিয়া উপভোগ করিতে পারিবে না? সেই আমার মানবরূপ। এই দুই রূপ একত্র আছে বলিয়া আমি আছি। ঠিক সেইরকম। রামমোহন রায়ের বিশেষ রূপ তাঁহার হিন্দুরূপ, অথচ তাহা তাঁহার বিরাট মানবরূপের প্রকাশের পক্ষে বাধাজনক হয় নাই। আমি সেই মহাপুরুষকেই আধুনিক সাধনার আদর্শ বা টাইপ বলিতে চাই। আমাদেরও সেই ভাবেই বুঝিতে

হইবে, আশ্রম সাম্প্রদায়িক কি অসাম্প্রদায়িক। ইহার সঙ্গে প্রাচীনের একটা যোগ আছে এবং ইহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয়, তা তো সত্য— কিন্তু ইহার মধ্যে সকল মনুষ্যেরই স্থান আছে ইহাও তেমনি সত্য। ইহার মধ্যে যদি কাল একজন য়ুরোপীয় বা নিগ্রো বা অন্য কোনো জাতির লোক আসিতে চায় সেও আসিবে, তবে তাহাকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতে হইবে এইটুকু যা কথা।

সুতরাং আশ্রমের মধ্যে আমরা যেন কোনোদিনই সাম্প্রদায়িক কোনো কথাই না তুলি, ইহার বিশ্বরূপটিই যেন দেখি। য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শে বিদ্যালয় হইতেছে, সংবাদ-পত্রে মধ্যে মধ্যে তাহার খবর পাওয়া যায়। বিশ্বপ্রকৃতির সহবাস ও আনুকূল্য ছাত্রদের হৃদয়মনের বিকাশের পক্ষে পুস্তকাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ দেনাপাওনার সম্বন্ধ যাহাতে না হয় তজ্জন্য তাঁহাদের একত্রাবস্থান বাঞ্ছনীয়, কোনো সামাজিক বা স্বাদেশিক সংস্কারে বালকবালিকাদিগের মন গোড়া হইতেই বাঁধা ঠিক নয়— এমনতরো আদর্শের কথা পশ্চিমদেশীয় লোকের মুখেও শুনি। ইংলণ্ডে অ্যাবট্‌হল্‌মে, জর্মনিতে হার্জে এমনতরো বিদ্যালয় দু-একটি হইতেছে তাহাও শুনা যায়। যদি তাই হয় তবে তাহাদিগকে আমাদেরই আশ্রম না বলিব কেন। যে আদর্শ আমরা সর্বোচ্চ বলিয়া স্বীকার করি সে কি আমাদেরই জনকতকের আদর্শ, না সমস্ত মনুষ্যের আদর্শ? সুতরাং এ বিদ্যালয় ব্রাহ্মের না হিন্দুর সে প্রশ্নই নাই, এ বিদ্যালয় সকলের— মুসলমান খৃস্টান যে আসে তার।

প্রাচীনকালে গৌতমের আশ্রমে যদি ভর্তৃহীনা জবালার সন্তান সত্যকাম স্থান পাইয়া থাকেন, উপনিষদে সে কথা থাকে, তবে এমন কে আছে যে বর্তমান আশ্রমে স্থান পাইবে না।

তবে একটি জায়গায় মিল থাকা চাই, সে এই বিশ্বজনীন আদর্শ। আধুনিক-যুগ-গুরু রামমোহন যে ভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন এ আশ্রম সেই ভাবে অসাম্প্রদায়িক; কিন্তু তাঁর সম্মুখে যে সংগ্রাম ছিল, ইহার মধ্যেও তাহাই আছে। সুতরাং যে আদর্শে আপনাদের ভেদবিভেদ সমস্ত মিলাইয়া দিব সেই সর্বোচ্চ সত্যের আদর্শই এখানকার। ওঁ পিতানোঽসি আমাদের মন্ত্র, পিতা তিনি সকলের, পিতানোঽবোধি আমাদের সাধনা — সেই বোধকে এখানে আমাদের জাগাইতে হইবেই।

আমি বলিয়াছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পর হইতেই আমরা কড়া ডিসিপ্লিনওয়ালা ও নীতিপরায়ণ হইয়া কঠোরতার চর্চায় মন দিয়াছিলাম; অথচ ভিতরে ভিতরে আমরা শুকাইয়া যাইতেছিলাম, আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও স্বাতন্ত্র্যপরতা কর্মের যোগে দূর না হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা তখন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ইহাকে দেখিতেছিলাম— কেহ দেশের দিক হইতে, কেহ-বা চরিত্র-গঠনের দিক হইতে। তখন ঐ বিশেষত্বের রূপই কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যে আধ্যাত্মিক আদর্শ সকল খণ্ড আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া সকল বিশেষত্বকে একমুখীন করিয়া দেয় তাহাকে তো আমরা চাহি নাই।

১৩১৫ সালের শেষ ভাগে নানা কারণে ভূপেনবাবু কর্ম-

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

জগদানন্দ রায়

ত্যাগ করিলেন। মোহিতবাবুর বিদায়ের পর হইতেই তিনি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সকলের দাদা ছিলেন, তাঁহার স্নেহ ও যত্ন হইতে কেহই বঞ্চিত ছিলেন না। এমনকি ভৃত্যেরাও তাঁহার স্নেহে বশীভূত ছিল। বিদ্যালয়ে পনেরো টাকা করিয়া পূর্বে লওয়া হইত, কিন্তু তাহাতেও আর্থিক অকুলান হয় বলিয়া ১৩১৩ সাল হইতে আঠারো টাকা করিয়া মাসিক ও কুড়ি টাকা করিয়া প্রবেশিকা লওয়া স্থির হয়। ভূপেনবাবুর মধ্যে একটি জিনিস ছিল যাহা এখানে আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই— সে ঐ পরসেবা, যাহার কথা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। রোগীর সেবা তাঁহার মতো প্রাণ দিয়া করিতে কাহাকেও দেখি নাই। দরিদ্রভাণ্ডার তাঁহারই যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তিনি ও তাঁহার বন্ধু হরিচরণবাবু উভয়ে তাহা হইতে অর্থ বস্ত্র দ্বারা দরিদ্রদের দুঃখ নিবারণ করিতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি পরিশ্রম করিতেন, একলা এই বৃহৎ বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচপত্র কাজকর্ম পরিচালনার ভার লইয়াছিলেন— আমাদের আবদার নিন্দা অভিমান সস্নেহ ক্ষমায় সহ্য করিতেন ও পিঠে হাত বুলাইয়া আমাদের শান্ত করিতেন। বালকেরা তাঁহার হৃদয়মাধুর্য অল্পই ভোগ করিয়াছে, কিন্তু অধ্যাপকেরা সকলেই তাঁহার স্নেহ-পরায়ণ হৃদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ১৩১৫ সালের শেষাশেষি তিনি বিদায় লইলেন। তাহার পর হইতে একটু একটু করিয়া আমাদের ধারণার মধ্যে এই কথাটি আসিতে লাগিল যে, কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করাই সাধনা— কর্মকে

ফলের দিক হইতে ধরিলে কেবলই বন্ধনের পর বন্ধন জড়ায়, নিজের মধ্যেও শান্তি থাকে না, বাহিরেও চারি দিক্ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমরা বুঝিলাম, ম্যাথ্যু আরনল্ড যে Two duties kept at one -এর সাধনার কথা বলিয়াছেন, যে দুই বিপরীত কর্তব্যকে সামঞ্জস্যে মিলাইতে হইবে— toil unsevered from tranquility, কর্মকে শান্তি হইতে অবিচ্যুত রাখিবার সাধনা— তাহাই আমাদের আশ্রমের মর্মগত সাধনা।

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলই হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি,
এ যাত্রা মোর থামাও।

সেই সময়ে কবি আমাদিগকে লইয়া প্রত্যহ মন্দিরে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তিনিকেতনের উপদেশাবলীর এইরূপে সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যেও বোধ হয় দুই দিকের সামঞ্জস্যের কথাই বারম্বার বলা হইয়াছে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। কেবল দুইটি অনুষ্ঠানের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য আজ শেষ করিব।

১৩১৫ সালে প্রতি ঋতুর আনন্দকে উৎসবের দ্বারা সজ্ঞানভাবে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য ঋতুতে ঋতুতে

উৎসবের আয়োজন করা হয়। বর্ষার উৎসব হইল— ইংরেজি সংস্কৃত বাংলা কাব্যসাহিত্য হইতে ছেলেরা আবৃত্তি করিল, বেদগান করিল এবং বর্ষাসংগীত করিল। তার পরে শরতে উৎসবের জন্য 'শারদোৎসব' রচিত হইল।

১৩১৬ সালে মহাপুরুষদিগের জন্ম কিম্বা মৃত্যুদিনে তাঁহাদিগের চরিত ও উপদেশ আলোচনার জন্য উৎসব করা স্থির হইল। খৃস্ট্‌মাসে প্রথম খৃস্টোৎসব হইল। তার পরে চৈতন্য ও কবীরের উৎসব হইয়াছিল। সকল মহাপুরুষকেই ভালো করিয়া জানিবার ও বুঝিবার সংকল্প হইতেই এ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি।

ইহার পর এখনকার কথা। কিন্তু তাহা এখনও এতটা দূরে যায় নাই যে তাহার ইতিহাস বলা যাইতে পারে, কিম্বা তাহার কোনো ছবি আঁকিয়া তোলা যাইতে পারে। সুতরাং এইখানেই শেষ করিতে হয়। আমার ভয় আছে যে হয়তো এই প্রবন্ধেই আমাদের তুচ্ছ ও অনিত্য কীর্তির কথাই বেশি করিয়া বলা হইয়াছে, অত্যুক্তি আসিয়া পড়িয়াছে, যদিও তাহাই বাঁচাইয়া চলিতে সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়াছি। আমি জানি যে, আমরা যাহা গড়িয়াছি তাহা কেবলই ভাঙিয়াছে— এ বিদ্যালয় আমাদের গড়া নয়, কারণ আমাদের সাধনা নাই, সত্যের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ নাই। যাহা করি তাহারই দ্বারা বদ্ধ হই, তাহাতে অহংকারই প্রকাশ পায়, বেদনা পাই এবং বেদনা দিই। ঈশ্বর এমনি করুন যে আমরা ক্রমেই আশ্রমে প্রবেশ করি। এখনই হয়তো মনে হইতেছে যে, বুঝি-বা

আশ্রমে আছি, কিন্তু হয়তো আছি নিজের স্বার্থের অন্ধকারায়, অহংকারের শতপাকবেষ্টনের মধ্যে। বিদ্যালয়ে নয়, সেই আশ্রমে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। কাজ তখন আমাদের হইবে না, যাঁর কাজ তিনি তাহা আপনি করিবেন।

মহর্ষি যে বলিয়াছিলেন যে, শান্তিনিকেতনের কাজ আপনি হইবে, তাহার অর্থ এতদিনে বুঝিতেছি। আমরা কত রকম করিয়া ইহার উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছি। কেহ ভাবিয়াছি যে, পুঁথি পড়াইবার সুপ্রণালী এখানে উদ্ভাবিত হইতেছে; কেহ ভাবিয়াছি যে, পুরাতন কালকে ইহাতে টানিয়া আনিবার একটা উদ্যোগ চলিতেছে; কেহ-বা ভাবিয়াছি যে, ছাত্রদের চরিত্রগঠন করিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধনের জন্য এখানে একটা চেষ্টা হইতেছে। এইরূপে নানা দিক দিয়া আমরা ইহার উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছি এবং নিজ নিজ কল্পিত উদ্দেশ্যকে দাঁড় করাইবার জন্য থাকিয়া থাকিয়া চেষ্টা করিয়াছি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তো এইটুকু চোখ ঈশ্বরের কৃপায় ফুটিল যে, বুঝিলাম যে, সেসকল উদ্দেশ্যকে বৃহত্তর আর-এক উদ্দেশ্যের মধ্যেই বিলীন হইতে হইবে। সে যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য—আপনাকে সকলের যোগে পরিপূর্ণ করা, সার্থক করা; আপনাকে সকলের যোগে পূর্ণ করা, কর্মের ভিতর দিয়া গুহাগ্রন্থি ক্ষয় করা, বিশুদ্ধ হওয়া, আনন্দিত হওয়া, ঈশ্বরে সমাহিত হওয়া। বস্, ঐ একটিমাত্র উদ্দেশ্য, তাহারই মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃত ব্যাপক আয়োজন আছে, দেশচর্যা আছে, সংসার-

সমাজের মঙ্গলসাধন আছে— কী নাই বলো। আকাশের মধ্যে যেমন একটি ধূলিকণাও আছে আবার অগণ্য গ্রহনক্ষত্র আছে, তেমনি এই বড়ো সাধনার মধ্যে ছোটো হইতে বড়ো সব জিনিসই আছে। কিন্তু মুখ্য ইহাই— আগে ইহা, পরে সমস্ত। অনন্ত আকাশকে বাদ দিয়া যদি ধূলিকণাকেই দেখি তবে তখন সে ধূলির আর কোনো সৌন্দর্য থাকে না; কারণ অনন্তের মধ্যেই তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য। তেমনি এই সাধনার অন্তর্গত করিয়া যাহা লইব, কিছুই আর অশান্তির কারণ হইবে না— জ্ঞানানুশীলন যদি লই, তবে তখন আশ্রম আর বিদ্যালয় হইয়া পড়িবে এ ভয় থাকিবে না। যদি এমন হয় যে, এখানে ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষারও সংস্থান হইবে, ক্রমে নানা বিদ্যালয়ের যোগে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ধারণ করিবে, এখানে নব নব জ্ঞানের বিকাশ দেখা দিবে— হোক্— সমস্তই ব্রহ্ম-সাধনার অন্তর্গত হইয়া থাকিবে, সমস্তের তলে তলে জাগিবেন সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যদি এমন হয় যে, এখানে পল্লী কতগুলি গঠিত হইয়া উঠে, যাহারা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে উদারভাবে সকলপ্রকার সংস্কার ও নিরর্থক আচারের বন্ধন অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া এখানে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করিয়া তুলিবে, রস্কিনের সংকল্পিত Company of St. George -এর মতো— তবে সেইসকল বিচিত্র মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্যেও জানিব যে, শিবং যিনি তিনিই প্রকাশ পাইবেন, সে সমাজসাধনাও তাঁহারই সাধনার অঙ্গীভূত হইবে। হোক কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র,

গো-মহিষশালা, আধুনিক যন্ত্রতন্ত্রের বিপুল আয়োজন— কখনোই তাহারই মধ্যে তাহাকে শেষ করিয়া দেখিতেই পারিব না— তাহাকে ছাড়াইয়া বলিব, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। আমার তো কল্পনা হয় যে, এ সমস্তই এই আশ্রমে হইবে। এই আশ্রমে মানে এই ভূখণ্ডটুকুর মধ্যে নয় এবং আমাদের খণ্ডকালটুকুর মধ্যেও নয়, কারণ আশ্রমকে আমি এই কয় কাঠা জমির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখি না তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সত্য আশ্রম আমাদের মানসলোকে, সে আদর্শ আশ্রম— এখানে এখন যেটুকু দেখিতেছ সে তাহার ক্ষীণতম অস্পষ্টতম ছায়ার ছায়া। এই এতটুকু ততটুকু, সামান্য তুচ্ছ আমাদের গড়া আয়োজনের মধ্যে সেই বিশ্ব-আশ্রমকে, সেই এক-একটি মানবজীবনকে ফুলের মতো ফুটাইয়া তুলিবার পুণ্যক্ষেত্র আশ্রমকে খর্ব করিয়া দেখিয়ো না। এই আশ্রমে আজ আমাদের কতটুকু জ্ঞানানুশীলন প্রকাশ পাইল। কিছুই নয়। কিন্তু একদিন এমন হইবে যে, এখানে দেশ-বিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহৃত হইবে— যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্য লাভ করিবে। সাহিত্য চিত্র সংগীত শিল্প এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানেই ব্যাখ্যাত হইবে। তত্ত্ববিদ্যায় যে সমন্বয়দৃষ্টি লাভের জন্য সকল জ্ঞানী এ দেশে এবং বিদেশে ব্যস্ত, এইখানে সেই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এইখানে ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ—সকল সংশয়ের ছেদন হইবে। এইখানে বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানের সত্যসকল উদ্ধার করিবেন, উদ্ভাবনী শক্তি

এইখানে নূতন নূতন জিনিস উদ্ভাবন করিবেন। সেই মানস-লোকের পরিপূর্ণ জ্ঞানতপস্যার সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে আজ দেখো। জ্ঞানের দিক দিয়া যেমন কর্মের দিক দিয়া তেমনি আমাদের কী সামান্য কর্মানুষ্ঠান হইয়াছে সে উল্লেখযোগ্যই নয়। আমরা যে এতগুলি ভাই এখানে মিলিয়াছি, আমাদের পরস্পরের সুখ দুঃখ কি আমাদের আপনার সুখ দুঃখ হইয়াছে। এখনও আমাদের প্রীতির ক্ষেত্র নিজ নিজ পরিবারেই আবদ্ধ ; আমাদের মধ্যে সেই নিবিড় অন্তরতর যোগবন্ধন তো হয় নাই, যাহাতে আমরা খুব কাছাকাছি আসিতে পারি। কিন্তু সর্বভূতে আপনাকে দেখা আশ্রমের আদর্শ— এখানে এমন পরিবার-সকল আসিবে যাহারা সহযোগী হইয়া একান্নবর্তী হইয়া কাজ করিবে ; যাহাদের প্রীতি ও মঙ্গলভাব সকলের প্রতি, পশুর প্রতি, পক্ষীর প্রতি, কীটপতঙ্গের প্রতি প্রসারিত হইবে ; যাহারা স্বাধীন হইবে, যাহারা কোনো মিথ্যার হাতে ধরা দিবে না, কোনো কদাচারকে প্রশ্রয় দিবে না ; যাহা সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যাহা নিত্য ও শাশ্বত ধর্ম, তাহাই জীবনের প্রত্যেক কর্মে আচরণ করিবে। যৎ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ— এমন কর্মই করিবে যাহা ব্রহ্মকে অর্পণ করা যায়। তাহারা প্রীতিকে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে খণ্ডিত করিবে না ইহা নিশ্চয়। দেখো সেই ভবিষ্যৎ আনন্দোজ্জ্বল সেইসকল দীপ্ত মূর্তিগুলি— এ দেশের মৃতপ্রায় সমাজকে যাহারা প্রাণ দিবে, ইহার গলার ফাঁস খুলিয়া ইহাকে রক্ষা করিবে। হে বন্ধুগণ, হে প্রিয়তম শিষ্যগণ, আজ সেই আশ্রমকে আমরা আনন্দে অভিবাদন করি, যাহা

সেই সুদূরের মধ্যে আপনার রচনা নির্মাণ করিতেছে। আজ আশায় আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হোক। এ আশ্রমের অন্তরে বাহিরে এখনও কত সংকট প্রচ্ছন্ন, কিন্তু অরুণবরণ উদার প্রভাতে সন্ধ্যাপয়োদকপিশ সেইসকল আতঙ্কের ছায়াকে ডরাইব না ; নিশ্চয় জানিব যে, সকল সংকট অতিক্রম করিয়া সেই মহা-আশ্রম একদিন জাগিবেই। এখানে যে মহাপুরুষ ঐ সপ্তপর্ণ-দ্রুমতলে তপস্যা করিয়াছিলেন তিনি এই আশ্রমের মধ্যে একটি অক্ষয় ব্রহ্মাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কেমন নিশ্চিন্ত ছিলেন— তিনি বলিয়াছিলেন, 'শান্তিনিকেতনের জন্য তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নাই, সেখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং আছেন, সেখানে কাজ হইবেই।' সেই কাজ এই একাদশ বৎসর ধরিয়া নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া হয়তো আরম্ভও হয় নাই এবং কত বৎসর ধরিয়া যে সে আপনাকে এই দুর্ভাগ্য দেশে সফল করিবে সে যাঁহার কাজ তিনিই জানেন। কিন্তু আমরা যেন তাই বলিয়া মনে করি না যে, আমরা ইহার বড়ো মূর্তি দেখিলাম না বলিয়া আমাদের কোনো নৈরাশ্যের কারণ আছে। ইহাকে যদি পরিপূর্ণ করিয়া দেখি তবে ইহার জন্য যাহা করিব তাহা শূন্য হইবে না, তাহা আমাদের সব অভাব ভরিয়া দিবে। আমাদের আত্মোৎসর্গ হইল না, আমরা আনন্দে এখানে সব শক্তি ঢালিয়া দিতে পারিলাম না ; কিন্তু হে সৌম্যগণ, তোমাদের যে দিন আসিবে সে দিন আমাদের অপেক্ষা উৎসাহ উদ্যম বল ভরসা লইয়া তোমরা কাজ করিয়ো। তখন তোমাদের কাছে আমরা ত্যাগ শিখিব, তোমাদের নির্মল

জীবনে আমাদের যত দুর্বলতা অপরাধ সব ধুইয়া যাইবে। আশ্রম এখনও একটি অপেক্ষা হইয়া আছে— সে তাপস চায়, ত্যাগী চায়। এখানে যাঁহারা যেটুকু আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন ও আমাদের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন। আজ সেই পূর্ব-আচার্যগণকে প্রণাম এবং ভাবী তাপসবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ ও প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া আমার এ আলোচনা শেষ করি। আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

হরিঃ ওঁ

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশ-ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥
মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকী-কানন॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে একতানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে একমন॥

পরিশিষ্ট

১
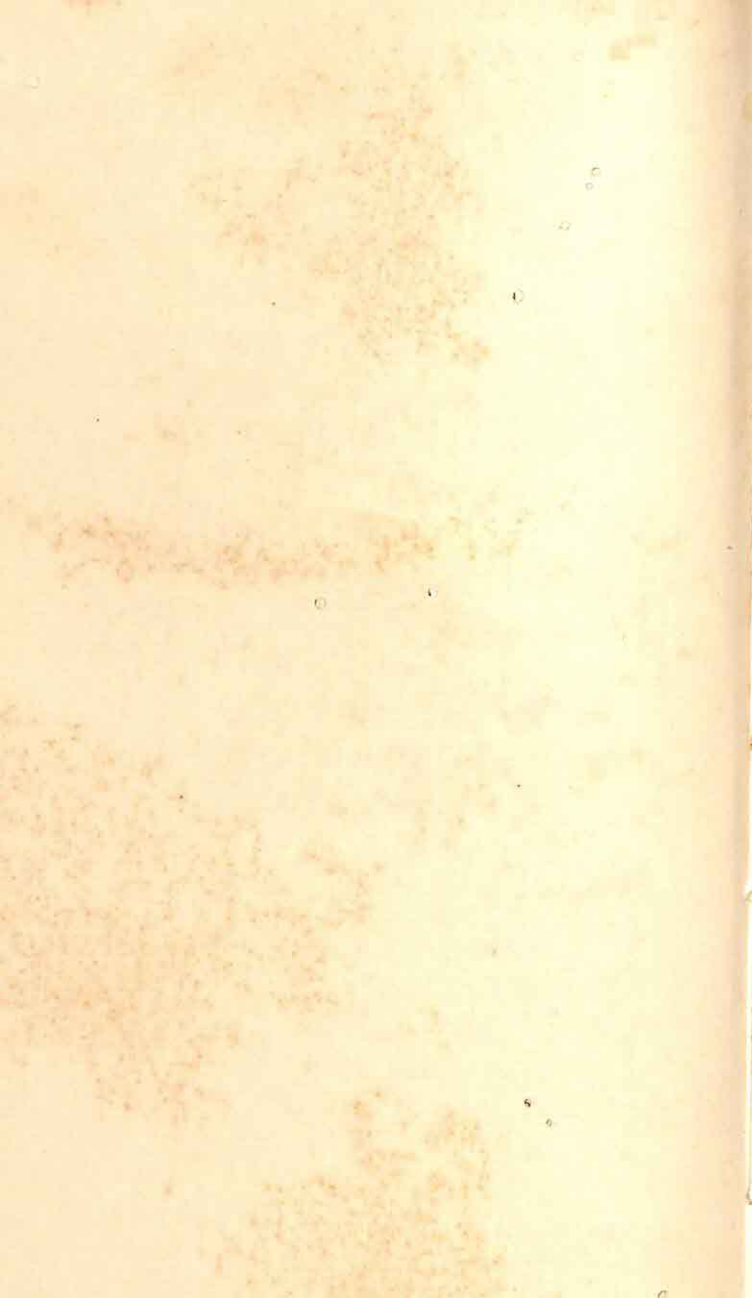
আশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যাপকগণ

১৩০৮-১৮

১৩০৮

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

রেবাচাঁদ

শিবধন বিদ্যার্ণব

১৩০৯-১১

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত

মিঃ লরেন্স

নগেন্দ্রনারায়ণ রায়

মোহিতচন্দ্র সেন

অক্ষয়কুমার বসু

সুবোধচন্দ্র মজুমদার

কুঞ্জলাল ঘোষ

সতীশচন্দ্র রায়

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবেন্দ্রনাথ

কানাইলাল গুপ্ত

তারিণীচরণ রায়

১৩১২-১৮

মিঃ কেল্‌কার

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সত্যেশ্বর নাগ

যোগীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নরেন্দ্রনাথ রায়

মিঃ সানো

পূর্ণচন্দ্র বাগচী

ভূপেশচন্দ্র রায়

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্যারীমোহন দত্ত

নবকুমার চক্রবর্তী

শ্রীশচন্দ্র রায়
ভূপেন্দ্রনাথ সেন
উপেন্দ্রনাথ দত্ত
হিমাংশুপ্রকাশ রায়
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আশ্রমের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ

১৩০৮–১৮

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অশোককুমার গুপ্ত
প্রেমকুমার গুপ্ত
অচ্যুতচন্দ্র সরকার
নকুলেশ্বর রায়
হিরণকুমার সিংহ
নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়
শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শচীন্দ্রনাথ সেন
দেবরঞ্জন গুহ
অরুণচন্দ্র সেন
সুজিতকুমার চক্রবর্তী
যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
নলিনী ভৌমিক
প্রণবদেব মুখোপাধ্যায়
কামাখ্যাকান্ত রায়
প্রফুল্ল দেববর্মা
অপূর্বকুমার চন্দ
নারায়ণ কাশীনাথ দেবল
ক্ষিতীশ মুস্তফি
সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
গৌরগোবিন্দ গুপ্ত
যতীন্দ্রনাথ দাস
ব্রহ্মবিহারী সরকার
অবনীনাথ মিত্র
অনিলকুমার সিংহ
রজতমোহন চট্টোপাধ্যায়
হিমাংশুনাথ রায়
যোগরঞ্জন গুহ
পুণ্যবজ্র
অরবিন্দমোহন বসু
উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
প্রেমানন্দ সিংহ
প্রমোদকুমার রায়
প্রিয়কান্ত রায়
পশুপতি সান্ন্যাল
প্রশান্ত দেববর্মা
গৌরগোপাল ঘোষ
মতিলাল দাস
যতীন্দ্রনাথ পালিত

শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
জগৎমোহন চট্টোপাধ্যায়
নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র
মাখন বসু
নৃপেন্দ্রনাথ বসু
রামরেণু গঙ্গোপাধ্যায়
রামশশী গঙ্গোপাধ্যায়
স্বকুমার বসু
পরিতোষ হালদার
অশোককুমার সেনগুপ্ত
মন্মথনাথ মিশ্র
বিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত
চণ্ডীচরণ সিংহ
সত্যেন্দু ভট্টাচার্য
প্রণবেশ সিংহ
ত্রিদিবেশ সিংহ
শশাঙ্ক সিংহ
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগেশচন্দ্র সেন
গিরিজা চক্রবর্তী
ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রবোধ গঙ্গোপাধ্যায়
হরিধন মুখোপাধ্যায়
স্বরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যভূষণ মজুমদার
যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী
বীরেন্দ্রনাথ মিত্র
মতিলাল বসু
তুহিনশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্যরঞ্জন বসু
অমরকুমার বসু
জ্যোতির্ময় হালদার
সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত
রামকৃষ্ণ রায়
জ্যোতির্মোহন মিশ্র
শশাঙ্কভূষণ সেনগুপ্ত
ভবানীকুমার রায়
হৃষীকেশ সিংহ
প্রমথেশ সিংহ
অমরেশ সিংহ
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
ফণীন্দ্রমোহন সেন
অময়কুমার বড়াল
হিমাংশু হাজরা
সরোজ দাস
নরেন্দ্র খাঁ
মাখন গঙ্গোপাধ্যায়
খগেন্দ্রকুমার সরকার
ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়
অমলকুমার রাহা

বলীন্দ্র মৌলিক
কল্যাণ চৌধুরী
মাখনচন্দ্র বসু
অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
বীরেন্দ্রনাথ বসু
ত্রিগুণানন্দ রায়
সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বিনোদবিহারী দাস
কালীপদ সেন
সমরেন্দ্রনাথ মিত্র
সুধীর মিত্র
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হরিহর ঘোষাল
সুবোধ সেন
রাধাবল্লভ কুণ্ডু
শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
রমেশচন্দ্র সেন

বিপুলকৃষ্ণ রায়
বিজেতা চৌধুরী
সুবোধচন্দ্র বসু
বিশ্বেশ্বর বসু
সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা
সরোজচন্দ্র মজুমদার
সুধীরঞ্জন দাস
সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
হরিশ্চন্দ্র দাস
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
দীনেন্দ্রকুমার দত্ত
ধীরেন্দ্র মিত্র
মুরলীধর পাল
দীনেশ সেন
হরিহর চক্রবর্তী
রমেশ চক্রবর্তী
যোগেশ ভট্টাচার্য
দুর্গাপ্রসন্ন সেন
অবনীনাথ রায়

২

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ট্রস্টডীড

পৃষ্ঠা ৭ দ্রষ্টব্য

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাং জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
সাং মানিকতলা, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী
হাল সাং পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা

স্নেহাস্পদেষু

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর
সাকিন শহর কলিকাতা জোড়াসাঁকো, হাল সাং পার্ক স্ট্রীট

কস্য ট্রস্টডীড পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী ডিস্ট্রিক্ট রেজেস্টারি বীরভূম সব-রেজেস্টারি বোলপুর পুলিস ডিভিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক

সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরের পত্তনির ডৌল খারিজান মৌজে ভুবননগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপশিলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংদিগরের নিকট হইতে মৌরসি পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতলা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুতপূর্বক মৌরসিস্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রস্টডীডের লিখিত কার্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন-নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রস্টী নিযুক্ত করিতেছি যে, তোমরা ট্রস্টীস্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডীডের শর্তমতো স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে চিরকাল এই ডীডের উদ্দেশ্য ও কার্য পশ্চাৎলিখিত নিয়ম-মতে সম্পন্ন করিয়া দখলীকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত-গণের ঐ সম্পত্তিতে কোনো স্বত্ব-দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ঐ ব্যবহারের প্রণালী এই ট্রস্টডীডে যেরূপ লিখিত হইল তৎবিপরীতে কখনও হইতে পারিবে না। এই ট্রস্টীর কার্য সম্বন্ধে ট্রস্টীগণের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশের মত

অনুসারে কার্য হইবেক। কোনো ট্রস্টী কার্য ত্যাগ করিলে কিম্বা কোনো ট্রস্টীর মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট ট্রস্টীগণ তাহার স্থানে এই ডীডের উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ে উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ধার্মিক ব্যক্তিকে ট্রস্টী নিযুক্ত করিবেন। নূতন ট্রস্টী সর্বাংশে এই ডীডের নিয়মাধীন হইবেন। উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রস্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে ঐরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু পক্ষী মনুষ্যের মূর্তির বা চিত্রের বা কোনো চিহ্নের পূজা বা হোমযজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্মানুষ্ঠান বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস-আনয়ন বা আমিষভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোনো ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোনোপ্রকার নিন্দা বা অবমাননা ঐ স্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজাবন্দনাদি-ধ্যানধারণার উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতিধর্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়। কোনোপ্রকার অপবিত্র আমোদপ্রমোদ হইবে না। ধর্মভাব-উদ্দীপনের জন্য ট্রস্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন।

এই মেলার উৎসবে কোনোপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না; মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনোরূপ আয় হয় তবে ট্রস্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথিসৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্মের উন্নতির বিধায়ক সকলপ্রকার কর্ম করিতে পারিবেন। ট্রস্টীগণ যত্নসহকারে চিরকাল ঐ অর্পিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তজ্জন্য এবং শান্তিনিকেতনের কার্য নির্বাহের নিমিত্ত তথায় একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তিকে আশ্রমধারী নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে পরিবর্তন করিতে পারিবেন। ঐ আশ্রমধারী ট্রস্টীগণের তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকিয়া কার্য করিবেন। যদি আশ্রমধারী আপনার শিষ্যগণ-মধ্যে কাহাকেও উপযুক্ত বোধ করেন তবে তিনি ট্রস্টীগণের লিখিত অনুমতি-গ্রহণে সেই শিষ্যকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু ট্রস্টীগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিতে পারিবেন না। কিম্বা আশ্রমধারী তাঁহার যে শিষ্যকে ঐরূপ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন, যদি ট্রস্টীগণের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি ঐ কার্যের উপযুক্ত না হয়, তাহা

হইলে তাঁহারা ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে আশ্রমধারী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশ্রমধারীর মনোনীত শিষ্যকে আশ্রমধারীর পদে নিযুক্ত করিবার ও তাহাকে পরিবর্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ট্রস্টীগণের থাকিবে। যদি কেহ কখনও এই আশ্রমের উন্নতি বা সাহায্যের জন্য কিছু দান করেন তবে ট্রস্টীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তাহা এই ডীডের লিখিত কার্যে ব্যয় করিবেন। এই ডীডের লিখিত উদ্দেশ্য সাধন ও কার্য নির্বাহ ও ব্যয় সংকুলান জন্য দ্বিতীয় তপশিলের লিখিত সম্পত্তিসকল দান করিলাম, উহার আনুমানিক মূল্য ১৮৩৫২ টাকা। ট্রস্টীগণ অদ্য হইতে ঐসকল সম্পত্তির সংরক্ষণ ও সর্বপ্রকার বিলি-বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ঐসকল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের সর্বপ্রকার ব্যয় ও রাজস্ব প্রভৃতি বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা দ্বারা আশ্রমের আবশ্যকীয় ব্যয়, আশ্রমের গৃহাদি মেরামত ও নির্মাণ এবং এই ডীডের লিখিত অন্যান্যসকল কার্যের ব্যয় নির্বাহ করিবেন; উক্ত প্রদত্ত সম্পত্তিসকলের আয়ের দ্বারা ট্রস্টের ব্যয় নির্বাহ হইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তবে ট্রস্টীগণ তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট বা কোনোরূপ নিরাপদ মালিকি স্বত্বে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিবেন, কিম্বা আশ্রম কিম্বা মেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। যদি কোনোরূপ সম্পত্তি কিম্বা প্রমিসরি নোট খরিদ করা হয় তবে তাহা ট্রস্টী সম্পত্তি গণ্য হইয়া এই ডীডের শর্তমতো ব্যবহার হইবেক। কিন্তু উদ্বৃত্ত আয় হইতে যদি কোনো গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট খরিদ করা

হয় তাহা হইলে যদি আশ্রমের কোনো কার্যে সেই প্রমিসরি নোট বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা ট্রস্টীগণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। ট্রস্টীগণ এই আশ্রমের আয়ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। এই ডীডের লিখিত কার্যসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কার্যে অর্পিত সম্পত্তির কোনোরূপ দান-বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর ও দায়-সংযোগ করিতে পারিবেন না, ও ট্রস্টীগণের নিজের কোনোরূপ দেনার নিমিত্ত এইসকল সম্পত্তি কিংবা তাহার কোনো অংশ দায়ী হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় তপশিলের লিখিত সম্পত্তির মধ্যে জেলা রাজসাহি ও পাবনার অন্তর্গত গালিমপুর ও ভর্তিপাড়া নামে রেশমের যে দুইটি কুঠি আছে কোনো কারণ বশতঃ ঐ কুঠিদ্বয়ের আয় যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিবেচনায় ট্রস্টীগণ এই দুই কুঠি বিক্রয় করিয়া তাহার মুল্যের টাকার দ্বারায় ট্রস্টীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট অথবা অন্য কোনো নিরাপদ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন। সেই খরিদা সম্পত্তি আমার অর্পিত মূল সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া এই ডীডের শর্তমতে কার্য হইবেক। এতদর্থে তৃতীয় তপশিলের লিখিত দলিল সমস্ত ট্রস্টীগণকে বুঝাইয়া দিয়া সুস্থচিত্তে এই ট্রস্টডীড লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
বৈশাখ ১৮১০ শকাব্দ

৩

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

পৃষ্ঠা ১২ দ্রষ্টব্য

'মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী, বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরেজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত— আমরা সুদূর ভূত কাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি। সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য

এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক। কে আমাদের স্টেট-সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইস্‌রয়, কে কোন্ আইন করিল, এবং কে সে আইন উলটাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা-মেঘরৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণগুল্মে ও ঋতুপর্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্মমৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা এখানকার নিভৃত শান্তি ও সরল সৌন্দর্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে এবং বালিকারা গোদোহনকার্য সারিয়া কুটিরপ্রাঙ্গণে গৃহকার্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

'জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও শয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে— কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি বৈদিক কালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে নালন্দা অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি শয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শ মাত্রই 'মিলেনিয়াম'এর দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে। আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা ; ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়— নহিলে আমরা আশ্রয় লইব

কোথায়, আমরা বাঁচিব কী করিয়া। আমাদের মাথা তুলিবার স্থান তো নাইই, মাথা রাখিবার স্থানও প্রত্যহ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মতো আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই— সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।'

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, 'বর্তমান কাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে তবে অতীত কালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।'

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কী, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর একটিমাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের

আদর্শকে অতীত কাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না— ত্রিশ কোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরেজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েক জনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন আপন কর্মে লিপ্ত। অথচ কয়েক জনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি দান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে— কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্বরজ্জু মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হউক, আমার সংকল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, কাজের দিক হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা এরূপ মনোরম এবং সুষমাবিশিষ্ট নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল, কোথায় সার্থকব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠ-ব্রহ্মচর্যের সৌম্যনির্মলজ্যোতিঃপ্রভা। তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম-আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখন ইহা রূপান্তরিত বাক্য মাত্র, ইহা আহ্বান।

—রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা,
'গুরুদক্ষিণা', সতীশচন্দ্র রায়